টুসু ব্রত ও গীতি-সমীক্ষা

ড. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খৃশ্চান কলেজ, বাঁকুড়া

পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
শ্রাবণী পূর্ণিমা, ১৩৫৮

প্রকাশক ঃ
শ্রীরবীন্দ্রনাথ মাজি
চাঁতুর, তারকেশ্বর, হুগলী

প্রচ্ছদ ঃ
শ্রীতপন কর

প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র মুদ্রণ ঃ
ইম্প্রেসন হাউস
কলিকাতা-৯

মুদ্রক ঃ
শ্রীমতী রেখা দে
শ্রীহরি প্রিণ্টার্স
১২২/৩, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৪

নিষ্ঠাবান প্রত্নতাত্ত্বিক ও প্রাবন্ধিক

শ্রীযুক্ত মাণিকলাল সিংহ

ও

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত

পরম মান্যবরেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ

কাব্য : প্রথম মুখ। ঘরে ভালোবাসার পাখি
ব্যথিত সময়। মুহূর্তের পাপড়ি।

সমালোচনা ঃ নাট্যবোধ ও নাট্যকার মধুসূদন
জীবনানন্দ প্রতিভা
আধুনিক কালের কবিতাচর্চা
রবীন্দ্রকাব্যে ফুল
রবীন্দ্রনাথ ও নদী
রবীন্দ্রকাব্যের উদ্ভিদ উপাদান (যন্ত্রস্থ)

সম্পাদনা ঃ বাংলা আমার বাংলাদেশ
(কবিতা সংকলন)
আমি ফুল ভালোবাসি
(ফুলের কবিতা সংকলন)
নীলদর্পণ (মঞ্চ-উপযোগী পুনর্বিন্যাস)

ভূমিকা

টুসু বা তুষু পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কৃষি-উৎসব। কৃষিউৎসব কৃষিভিত্তিক সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব। গভীরভাবে বিশ্লেষণ কর্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কৃষি-ভিত্তিক সমাজে বৎসরের মধ্যে যে কয়টি উৎসব উল্লেখযোগ্য, তাদের প্রায় সব কয়টি একভাবে না একভাবে কৃষিকর্মের সঙ্গে জড়িত। এমন কি, তা ক্রমে কৃষকের সমাজ থেকে অভিজাত সমাজে উন্নীত হয়ে বাইরের দিক থেকে কোনো অভিজাত রূপ নিলেও তার মৌলিক কৃষি-চরিত্র তাতে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে নি। তার নিদর্শন বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা। দুর্গাপূজা আজ সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রচলিত হলেও তার মূল যে কৃষি-উৎসব তা তার বোধনের দিন নব-পত্রিকার প্রতিষ্ঠা থেকে আজো সুস্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। প্রকৃতপক্ষে দুর্গাপূজা নব-পত্রিকারই পূজা। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে নানা শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক উপকরণে আজ তা ভারাক্রান্ত এবং জটিল হয়ে উঠলেও তার মূল উদ্দেশ্য শস্যসম্পদশালিনী ধরিত্রীরই পূজা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীকে শাকম্ভরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শাকম্ভরী শব্দের অর্থ শাকসব্জী দিয়ে যে নিজেকে ভরে রাখে। ধরিত্রীরই এই গুণ। সকল কৃষিকর্মের দ্বারা ধরিত্রীকেই শাকসব্জী দিয়ে ভরিয়ে রাখা যায়। সেই শাকসব্জীই মানুষের জীবন রক্ষা করে। সেইজন্য কেবলমাত্র কৃষক সমাজ নয়, যারা কৃষিকর্মের উপর নানাভাবে নির্ভরশীল তারাও কোনো না কোনোভাবে কৃষিউৎসব উদযাপন করে থাকে।

কিন্তু কৃষিউৎসব বৎসরে যে একবারই হয়, তা নয়। যদিও ফসল ঘরে আন্‌বার পর মুহূর্তেই যে কৃষিউৎসব হয়, তাই স্বভাবতঃ শ্রেষ্ঠ কৃষিউৎসব। তথাপি কৃষিকর্মের বাৎসরিক সূচনা থেকে আরম্ভ করে নানা পর্যায়ে তার অগ্রগতি উপলক্ষে ছোট বড় নানা

প্রকার কৃষিউৎসব উৎযাপিত হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে অনেক-গুলো অনুষ্ঠান হয়ত বাহ্যতঃ আড়ম্বরপূর্ণ কোনো উৎসবের রূপ লাভ করে না। তারা হয় ত পারিবারিক অনুষ্ঠান কিংবা মেয়েলীব্রত মাত্র। তথাপি তাদের উদ্দেশ্য একই। প্রকৃতপক্ষে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের অম্বুবাচী থেকে আরম্ভ করেই শস্যোৎসবের সূচনা দেখা দেয়। পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় টুসু পরব দিয়ে তার সমাপ্তি (Culmination) ঘটে। সমাপ্তি উৎসবটির বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ। কেবল মাত্র এই বিভিন্ন রূপগুলোর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং পরিণতি নিয়ে যদি আলোচনা করা যায় তবেও একটি মূল্যবান গবেষণামূলক গ্রন্থ হতে পারে। সুতরাং টুসু উৎসব বাংলায় শস্যোৎসবের আংশিক পরিচয় মাত্র, তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নয়। একটি কৃষিভিত্তিক জাতির শস্যোৎসবের পূর্ণাঙ্গ রূপের মধ্যে তার সাংস্কৃতিক জীবনের অনেকখানি পরিস্ফুট হয়ে থাকে।

টুসু উৎসব বাঙালীর কৃষিউৎসবের আংশিক পরিচয়বাহী হলেও তা নানা দিক দিয়ে আঞ্চলিক বিশেষত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ যে অঞ্চলে এই বিশেষ প্রকৃতির উৎসব প্রচলিত, সেই অঞ্চলে শস্যোৎপাদন বাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে কষ্টসাধ্য এবং অনিশ্চিত। যেখানে অনায়াসে বা অল্প আয়াসে কৃষিসম্পদ নিশ্চিতভাবে লাভ করা যায়, সেখানে তার যা মূল্য তার তুলনায় যেখানে বহু আয়াস স্বীকার করে নানা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্য থেকে তা উৎপাদন করা যায়, সেখানে তার মূল্য অনেক বেশি। সেই সম্পদ দৈব তুর্বিপাকে না পাওয়ার দুঃখ যেমন তীব্র, দৈবাৎ পাওযাব আনন্দ তেমনই গভীর। কৃষি নির্ভর সমাজ এখানে দৈবনির্ভর, কেবলমাত্র কৃষিশ্রম-নির্ভর নয়। সেইজন্য কৃষির ফসলের যখন সত্য সত্যই মরাইয়ে আর স্থান সঙ্কুলান হয় না, তখন গৃহস্থের ঘরে ঘরে উৎসবের বান ডাকে, সেই বান আর কোনো বাধা মানে না। ঠিক এই অবস্থা বাংলাদেশের আর কোনো অঞ্চলেই দেখা যায় না। তার কারণ, আগেই বলেছি,

বাংলার অন্যত্র কৃষির ফসল এই অনাবৃষ্টির অঞ্চলের মত এত অনিশ্চিত নয়।

টুসু উৎসবের প্রধান অঙ্গ তার পূজো নয়, তার সম্পর্কে কোনো ব্রত নয়, বরং তার সঙ্গীত। লোক-সঙ্গীত যে নিরক্ষরগোষ্ঠীর সমাজে কত শক্তিশালী তার প্রমাণ টুসু সঙ্গী বা টুসুর গান। সারা পৌষ মাস ধরেই ঘরে ঘরে এই গান চল্‌তে থাকে। কিন্তু মাসের শেষের দিন অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির দিন যেদিন টুসুর ভাসান সেদিন এই গানের স্রোত যেন আর বাঁধ মানে না - অনর্গল বেগে নারী-হৃদয় থেকে তা স্বতঃ উৎসারিত হতে থাকে। সেদিন গৃহস্থের আঙ্গিনা থেকেই সে গানের সূচনা হয়। তারপর মুহূর্তে তাতে পথ ঘাট মুখরিত হতে থাকে, তা থেকে আকাশ বাতাস, তারপর নিকটবর্তী কোনো নদীতীরে গিয়ে তার শেষ পর্ব সমাপ্ত হয়। সেই গান কোনো পূজার গান নয়, ব্রতের গান নয়, আচারমূলক গান নয়, সে গান জীবনের গান। এইখানেই টুসু উৎসবের বিশেষত্ব। টুসু উপলক্ষ্য মাত্র, জীবনই তার লক্ষ্য। এই গানের ভিতর দিয়ে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তিত হয় না বরং তার পরিবর্তে গৃহস্থ কন্যার বাস্তব জীবনের মান-অভিমানের পালা অভিনীত হয়।

এত বড় পোষ পরবে
রাখ্‌লি মা পরের ঘরে,
মা, আমার মন কেমন করে,
যেন শোল মাছে উফাল মারে।
আমি থাক্‌ব না আর তোর ঘরে।
মায়ে দিল মাথা বেঁধে, দেগো মাসী ফুল গুঁজে,
বিদায় দে মা সংসারের কাজে।

মেয়ের দুর্জয় অভিমান। পোষ পরবের দিন মা তার খোঁজ করল না। পরের ঘরে তার পরবের দিনগুলো কাটাতে হলো। এ দুঃখ কি সহ্য হয়?

কিন্তু মা ত জানে কেন যে পরবের দিন তিনি তার কন্যার সংবাদ নিতে পারেন নি। সে কথা কন্যাকে ত খুলে বলবার নয়, তা কন্যা বুঝে না।

এখানে শস্যও নাই, শস্যের কোনো দেবতাও নাই। এমন কি, মরাই শস্য দিয়ে পূর্ণ করবার যে আনন্দ, তাও নেই। উৎসবেরও কোনো কিছু নেই। তবু তাকে বলি টুসুর গান, শস্যোৎসবের গান। প্রকৃত পক্ষে এ গার্হস্থ্য জীবনের একটি ক্ষুদ্র মান-অভিমানের গান। উৎসবের পরিপূর্ণতার মধ্যেই বঞ্চনার আঘাত তীব্র হয়ে বিঁধে। মান-অভিমানের কথা সেদিনই বেশি প্রকাশ পায়। তাই তাতে উৎসবের কিছু না থাকা সত্ত্বেও তা উৎসবেরই গান। কারণ, উৎসব উপলক্ষে মনের আগল এমনিভাবে খুলে না গেলে এ গান কোনোভাবেই কোনোদিন প্রকাশ পেত না।

টুসু গানের এই বিশেষত্ব। সারা বৎসরের সঞ্চিত ব্যথা উৎসবের দিনে মনের ভিতর থেকে যেন মুক্তি পায়। তাই উৎসব মাত্রই ব্যথার আরতি, টুসু গানেও আমরা তা পাই।

আগেই বলেছি, টুসু জীবনের গান। তাই কেবল মাত্র ব্যথার কথাই তার ভিতর শুনতে পাওয়া যায় না। জীবনের আনন্দ-বেদনা সবই তার মধ্যে ধরা পড়ে। তবে সঙ্গীতে ব্যথার কথা যত মধুর, আনন্দের কথা তত নয়। ব্যথার গানই প্রাণকে বেশি নাড়া দেয়।

কোনো কোনো গানের ভাষা যেমন বেদনায় করুণ, তেমনই আর এক শ্রেণীর গান সাংসারিক জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতায় কঠিন,—

> এক গাড়ি কাঠ দুই গাড়ি কাঠ কাঠে আগুন লাগাব,
> আগুন যখন হুদ্‌হুদাবে সতীনকে ঠেলে দিব।
> সতীন আমার জনমের বাদী।

সতীন যে সতীনের জনমের বাদী তাতে কিছু মাত্র সংশয় নেই।

কিন্তু সে জন্য সতীনকে জ্বলন্ত আগুনে ঠেলে ফেলে দিবার সঙ্কল্প যেমন কঠোর তেমনই অসামাজিক। কিন্তু সতীনের পক্ষে তা কিছুই অসম্ভব নয়। কারণ, এ দেশে একদিন মেয়েরা কুমারী জীবনেই ভবিষ্যৎ সতীনের কণ্টক দূর করবার জন্য 'সতীন কেটে আল্‌তা' পরবার ব্রত করত। সেই কথাই এখানে টুসু উৎসব উপলক্ষ করে বলা হয়েছে। কুমারী হৃদয়ের মধ্যেও যে কি ভয়ংকর জিঘাংসা শৈশব থেকেই লালিত হতে থাকৃত এই ছড়াগুলো তার প্রমাণ। এগুলো কেবলমাত্র একটা বিশেষ যুগের বিশেষ একটা সামাজিক অবস্থাই নির্দেশ করে না। বরং চিরন্তন নারী মনের এক গোপন মনস্তত্ত্বের দ্বার খুলে দেয়। সেইজন্য গানগুলোর সামাজিক এবং সাহিত্যিক মূল্য ব্যতীতও চিরন্তন এক বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে।

উপরে যে টুসু গানটি উদ্ধৃত করলাম, তাতেও দেখা যাবে কোথাও টুসু দেবতার উল্লেখ নেই। তার পূজারও কোনো ইঙ্গিত নেই। কিংবা যে শস্যোৎসব উপলক্ষে এই গানগুলো সহস্র নারীকণ্ঠে গীত হচ্ছে, তার শস্যের কিংবা কৃষিকর্মের কোনো উল্লেখ নাই। সহজভাবে জীবনের সুখ-দুঃখের কথা, তার সুকঠিন অভিজ্ঞতার কথা গানগুলোর মধ্য দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যদি তার মধ্যে ধর্মের কথা, টুসু ঠাকুরাণীর কথা, তার পূজোর কথা থাকৃত, তবে এই সঙ্গীত এত স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজ হতে পারত না, পদে পদে আড়ষ্টগতি হতো। কোনো কোনো গানের মধ্যে যে পূজো এবং তার আচারের কথা নেই, তা নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে এই ত্রুটি অপরিহার্য হয়েছে।

পরিবারের একটি শিশু অনেক দিন রোগ ভোগের পর আজ অন্নপথ্য করবে। শস্যোৎসবের দিন জননীর মনে সেই আনন্দ দিনের স্মৃতিটিও জেগে ওঠে,

আবার রামের জ্বর এসেছে চারধারে ডাক্তারবাবু,

ছাড় ছাড় ডাক্তারবাবু, আমার রাম আজ ভাত খাবে।
কি কি করব তরকারী ?
মুগ মুসুরি পটল ভাজা মাগুর মাছের ঝোল করি।

সুতরাং টুসুর শস্যোৎসব উপলক্ষ করে নারী মনে গীতিনির্ঝরের যেন স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে থাকে। সেই পথ ধরে অনর্গল সঙ্গীতের ধারা উৎসারিত হতে থাকে, তা আর কোনো দিক থেকেই বাধা মানে না।

টুসুর গানের পদগুলো গায়িকার মনে স্রোতের ধারার মত প্রবল বেগে আপনা থেকেই আসে। ভেবে চিন্তে তা সৃষ্টি করতে হয় না। যদি তা করতে হতো, তা হলে তার মধ্যে এত অজস্রতা যেমন থাকৃত না, এমন স্বতঃস্ফূর্তভাবও থাকৃত না। কিন্তু স্রোতের জলেও যেমন শেওলা ভেসে আসে, এই গানগুলোর মধ্যে সব গানই চিরন্তন হয়ে বেঁচে থাকবার মত রস ও সৌন্দর্য নিয়ে রচিত হয় না। তাই যাঁরা এই গীতি সংগ্রহ করবেন, তাঁরা যদি জহুরী না হন, তা হলে তাদের সংগ্রহের মধ্যে সব সময় খাঁটি মনিমুক্তো পাওয়া যাবে না। অনেক সময় মেকি জিনিষ ভেল্‌কি দেখাবে। তার ফলে সব জিনিষটার উপরই একটা অশ্রদ্ধা এসে যাবে। তাই এই বিষয়ে নিপুণ জহুরী প্রয়োজন। তাই যে কেউ এগুলোর সংগ্রহ কর্ম সার্থক করে তুলতে পারে না।

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ সামন্ত দীর্ঘকাল যাবৎ বাঁকুড়া খৃশ্চান কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করবার পরও যে আঞ্চলিক লোক-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হয়েছেন, তা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। বাঁকুড়া জেলা নানা ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিক কারণে লোক-সংস্কৃতির দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ, সে কথা আজও আমরা যথার্থ উপলব্ধি করতে পারিনি। তা যদি পারতাম তা হলে বাঁকুড়া জিলার শত শত পরিত্যক্ত মন্দিরের কেবলমাত্র ইট পাথরগুলো মেপে তাদের ছবি প্রকাশ করেই এই বিষয়ে

আমাদের কর্তব্য সম্পন্ন হয়েছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ কর্‌তে পারতাম না, প্রত্যেকটি ইটের গায়ে যে কাহিনী কিংবা কাহিনীর অংশ খোদাই করা আছে, তা উদ্ধার করতে ব্রতী হতাম। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, প্রাচীন মন্দিরগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু যাঁরা সমাজের মনস্তত্ত্ব অনুধাবন কর্‌তে পারেন তাঁরা জানেন যে প্রাচীন মন্দিরগুলো যুগে যুগে নূতন নূতন ভূমিকা পালন করে। এক যুগের বৌদ্ধ কিংবা জৈন মন্দির পরবর্তী যুগে সূর্যমন্দিরে পরিণত হয়েছে, তারও পরবর্তী যুগে শিবমন্দিরে পরিণত হয়েছে, এবং গ্রামদেবদেবীর মন্দিরে তার শেষ পরিণতি দেখা গিয়েছে। এই পরিবর্তনের ধারায় যে কত নূতন নূতন লোক-শ্রুতি বা জন-প্রবাদ সৃষ্টি হয়ে চলেছে, তার হিসেব নাই। যতদিন মানুষ আছে ততদিন তার ধারা অনন্ত প্রবাহে চলেছে। এমন কি, মন্দির যখন নৈসর্গিক কারণে মাটির সঙ্গে মিশেও যায়, তখনও তার উপর রচিত কিংবদন্তীগুলো সজীব থাকে। শুধু তাই নয় জনসাধারণের জীবন-যন্ত্রকে তা নিয়ন্ত্রিত করে।

পুরুলিয়া-বাঁকুড়া এমনি জেলা, যার জীর্ণ মন্দিরগুলো কথা বলে। তবে তার ভাষা যে বুঝে সে তার কথা বুঝে, অন্য কেউ বুঝে না। যারা বুঝে না তারাই মনে করে মন্দিরগুলো পরিত্যক্ত। সে ভাষা বুঝবার জন্য আঞ্চলিক লোক সঙ্গীত জানা আবশ্যক।

অধ্যাপক সামন্ত যে তাঁর সচেতন রসদৃষ্টি নিয়ে বাঁকুড়ায় এতদিন ধরে বাস করছেন, বর্তমান সংগ্রহটি তার প্রমাণ। তিনি নিরক্ষরের সাহিত্যকে উপেক্ষা করেন নি। তার মধ্যে যে সাহিত্যের রস আছে তা সার্থক উপলব্ধি করেছেন এবং শ্রম স্বীকার করে বাঙালী পাঠকদের তিনি তা সংগ্রহ করে উপহার দিয়েছেন। তাঁর প্রচেষ্টাকে আমি সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাই।

রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট অব ফোক কালচার
কলিকাতা, ১৩৫৮ সাল

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

নিবেদন

মাতৃঋণ শোধ করা যায় না। তবু চেষ্টা করতে হয়। বাঁকুড়া আমাকে প্রায় এগার বছর ধরে অন্ন দান করেছে। বাঁকুড়ার লোকসাহিত্যের সামান্য পরিচয় তুলে ধরে মাতৃঋণ পরিশোধের দীন চেষ্টা করেছি। লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতিতে বাঁকুড়ার ঐশ্বর্য অসীম।

বাঁকুড়াকে ভালোবেসেই এই বইয়ের জন্ম হয়েছে। জীবনের সতের বছর কলকাতায় কাটিয়েছি। কলকাতা থেকে দূরে সরে এসে আনন্দের সঙ্গে দেখতে পেয়েছি রাঢ় বাংলার ও মল্লভূমের নিজস্ব সংস্কৃতির রূপ ও স্বরূপ। তুষু গান সঞ্চয়, সংকলন ও এই দীর্ঘ আলোচনা তারই এক দিকের ফলশ্রুতি।

আরও একটি কারণে এই ধরণের গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেছি। আধুনিক বাংলা কবিতার চর্চা করতে করতে মনে হয়েছে তা একটি মানসবৃক্ষের শাখা প্রশাখা ফুল ফল মাত্র। সেই বৃক্ষটির মূল কোথায়? তার মৃৎলগ্ন কোন সত্তা আছে কি না? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে জীবনানন্দ বা রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ছেড়ে লোক কবিতার পরিচয় নিতে হল। এই গ্রন্থে তুলনামূলক আলোচনা করার সুযোগ নিইনি, সে আলোচনা অন্য সূত্রে ও সুযোগে করার ইচ্ছা আছে।

তুষু ব্রত ও গান রাঢ়ভূম, মল্লভূম, মানভূম অঞ্চল জুড়ে আজও অনুষ্ঠিত ও গীত হচ্ছে। সেই সুবিশাল দেশ ও কালকে তুলে ধরার অক্ষম চেষ্টা না করে শুধু বাঁকুড়া জেলার তুষু পরিচয় অন্বেষণ করেছি। তাতে তুষুকে একটি দেশ খণ্ডের গণ্ডীতে সামগ্রিক ভাবে ধরা গেছে বলেই মনে করি। স্বল্প হলেও তুলনা করে দেখার একটি সুযোগ নেওয়া হয়েছে। তাই হুগলী জেলার তুষু সম্বন্ধে কিছু আলোচনাও করা হয়েছে। 'পরিশিষ্ট' অংশে সংকলিত এবং প্রবন্ধ-গুলির মধ্যে ব্যবহৃত সব গানই (হুগলী জেলারগুলি গান নয়, ছড়া মাত্র) বাঁকুড়া জেলার গ্রাম গঞ্জ শহরের ধনী দরিদ্র পরিবার

থেকে, ব্রতক্ষেত্র, মেলা এবং উৎসব অঙ্গন থেকে সংগৃহীত। উচ্চ-শ্রেণীর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বৈদ্যক্ষত্রিয় পাড়া থেকে, অনুন্নত বাউরী ডোম পাড়া থেকে, এমন কি বারাঙ্গনা পল্লী থেকেও গান সংগ্রহ করেছি। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সমাজে কম নয়, কিন্তু অনুন্নত সমাজেই তুষু গানের ঢল নামে বেশী।

মোট দশটি প্রবন্ধে তুষু সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করতে গিয়ে পাণ্ডিত্যের উদ্ধৃতিস্তুপাকৃতি ভার বহন করে আনিনি। কয়েক বছর ধরে তুষু ব্যাপারটি নিষ্ঠার সঙ্গে দর্শন করেছি এবং অনুধাবন করেছি। মাটির কাছাকাছি মানব সমাজে যে গান লক্ষ কণ্ঠে উৎসারিত হয় তাঁর সরল স্বাভাবিকতাটুকু রক্ষা করতে চেয়েছি আলোচনায়। মনে করি, লোকসাহিত্যের আলোচনা বহুল সমাদৃত অভিজাত সাহিত্যের আলোচনার মতো হওয়া উচিত নয়।

এই বইয়ে ব্যবহৃত বানান সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। তুষু ব্রতিনীরা যে ভাবে উচ্চারণ করেছেন সেই ভাবেই বানান রাখার চেষ্টা করা হয়েছে তুষু ছড়া ও গানের। তাই বানানে বৈচিত্র্য দৃষ্টিগোচর হবে সুধী পাঠকের। বানান শুদ্ধ করে আধুনিক রীতি-সম্মত করে তুললে লোক সাহিত্যের আসল রূপটা (original form) নষ্ট হয়ে যায়। তুষু গানের মধ্যে এমন সব শব্দের আবির্ভাব ঘটেছে যার ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা হওয়ার খুবই দরকার। কিন্তু সে বিষয়ে আমার অধিকার তেমন নেই। বিনয়ের সঙ্গে এই অক্ষমতা স্বীকার করি।

আলোচনা ও সংকলন মিলিয়ে প্রায় চারশত গান বইটির মধ্যে আছে। কিন্তু একটি গানও অন্য কোন পুস্তক বা পুস্তিকা থেকে নেওয়া হয়নি। সবই field work-এর পদ্ধতি মেনে গায়ক গায়িকাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা।

গান সংগ্রহের ব্যাপারে বাঁকুড়া খৃশ্চান কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা

আন্তরিক সাহায্য করেছেন। তাঁছাড়া শ্রীমতী বুলু নন্দী, শ্রীমান দিলীপ চন্দ, কিরীটী চন্দ, জগজ্জ্যোতি বড়ুয়া, নিরঞ্জন মাহাতো, শিবরঞ্জন মণ্ডল, দুর্গা দত্ত, অভয়া গাঙ্গুলী, শুক্লা সরকার, মনীষা সরকার, মুকুলেশ্বর কুচলা এবং শ্রীঅরবিন্দ চট্টোপাধ্যায় (অধ্যক্ষ, সুরনির্ঝর সঙ্গীত শিক্ষায়তন, বাঁকুড়া) যে ভাবে সাহায্য করেছেন তা আমার আশার অতীত। স্থানীয় সংগীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাকল বরাট তিনটি গানের স্বরলিপি রচনা করে দিয়ে গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। আমার কাছে বিভিন্ন তুষু গানের সুরবৈচিত্র্য 'রেকর্ড' করা আছে। এ বইয়ের মধ্যে তুষু ব্রত ও উৎসব বিষয়ক কিছু ছবিও দেওয়া হয়েছে। অবশ্য সব কটি ছবি বাঁকুড়া জেলার নয়। বাঁকুড়া-প্রান্তিক পুরুলিয়ার ছবিও এর মধ্যে আছে।

এই বইয়ের কোন কোন অংশ স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে ছত্রাক (পুরুলিয়া), সমকালীন (কলকাতা), দর্শক (কলকাতা), মহুয়া (তারকেশ্বর) প্রভৃতি পত্রিকায় পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদককে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই।

পুরুলিয়া প্রবাসী, লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি প্রেমিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধ বসু রায় এবং সহকর্মী সম্পাদক-অধ্যাপক শ্রীলীলাময় মুখোপাধ্যায় নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে আমার নৈরাশ্য ও আলস্য দূর করে দিয়েছেন। তাঁদের ভালোবাসার ঋণ শোধ করার ধৃষ্টতা আমার নেই। আমার শিক্ষাগুরু ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের লোকসাহিত্য পঠন-পাঠনের অবকাশে যে ভাবে কাজ করেছেন আমিও সেই ভাবে কাজ করতে চেয়েছি। ডঃ দুলাল চৌধুরী 'একাডেমি অব ফোকলোর' -এর সদস্যদের নিয়ে যখনই কলকাতা থেকে বাঁকুড়া পরিক্রমায় এসেছেন তখনই তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি এবং বাঁকুড়া সংস্কৃতিকে বুঝতে শিখেছি। আকাশবাণী কলকাতার 'জেলা-বেতার' অনুষ্ঠান তৈরী করার জন্য শ্রীযুক্ত সুনীল সাহা ও শ্রীমতী কৃষ্ণা সমাদ্দার

লেখককে সঙ্গী করেছেন বারবার। তাঁদের দেখার ভঙ্গি দিয়েও বাঁকুড়াকে দেখতে শিখেছি। বর্তমান বইটি প্রকাশের জন্য সর্বান্তরিক সাহায্য করেছেন লোকসংস্কৃতি গবেষক শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মিত্র, তাঁর অকৃপণ দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাঁকুড়া জিলা গ্রন্থাগারের মাননীয় গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত ক্ষৌনিশ বিশ্বাস, স্থানীয় সমাজসেবী শ্রীযুক্ত দেবী পালিত, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সুনীলকুমার দাস, অধ্যক্ষ ডঃ অশোক কুণ্ডু, অধ্যাপক ডঃ স্বপন বসু প্রভৃতি সুধীজন নিরন্তর উৎসাহ দিয়ে লেখককে অনুপ্রাণিত করেছেন।

আমার সহকর্মী অধ্যাপক তুলসী মুখোপাধ্যায় তুষু প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি তৈরী করার সময় বহু আঞ্চলিক শব্দের অর্থবোধে সাহায্য করেছেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ মাজি গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে লেখককে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। ভ্রাতৃপ্রতিম অনুপকুমার মাহিন্দার বইটি প্রকাশের নিরস দায়িত্বগুলি হাসি মুখে পালন করেছেন। ঈশ্বর এঁদের কল্যাণ করুন।

মতপার্থক্যে সত্ত্বেও বিশ্বখ্যাত লোকসংস্কৃতি প্রচারক ও লোক সাহিত্য গবেষক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য একটি ভূমিকা রচনা করে দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের পূজনীয় অধ্যাপক। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই বসন্তরঞ্জন রায়, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সত্যকিংকর সাহানা প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বাঁকুড়া তথা মধ্যরাঢ়ের সংস্কৃতি পরিচয় তুলে ধরার যে চেষ্টা শুরু করে ছিলেন তারই অনুসরণে এগিয়ে এসেছেন অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন, বিনয় ঘোষ, পি লাল প্রভৃতি নিরলস গবেষক। বাঁকুড়ার কোন কোন পত্রিকা গোষ্ঠী যথা বাঁকুড়া হিতৈষী, সুচেতনা, টেরাকোটা, অভিযান, পথের সংগ্রহ, বাঁকুড়া বার্তা, ইন্দিরা, অবান্তর, অপাংক্তেয়, কস্তুরী,

ভেলা, অশনি প্রভৃতি বাঁকুড়া বিষয়ে প্রবন্ধাবলী প্রকাশের আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাঁদের প্রচেষ্টা দীর্ঘকালীন ও ফলবতী হলে তা হবে অপার আনন্দের বিষয় এবং তার ফলে আমাদেরই উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের (বিষ্ণুপুর শাখা) শ্রীযুক্ত মাণিকলাল সিংহ ও শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত বাঁকুড়া বিষয়ক দীর্ঘ গবেষণা নির্ভর বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এখনও রচনা করে চলেছেন। স্বতন্ত্র ভাবে দুঃখভঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম সুন্দর শুকুল, ডঃ মিহির কামিল্যাচৌধুরী, সুখময় চট্টোপাধ্যায়, কান্তি হাজরা প্রভৃতির প্রবন্ধও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পরিশেষে বিনীত ভাবে আর একটি নিবেদন রাখি। সমগ্র পুরুলিয়া বাঁকুড়া, বীরভূম জেলায় এবং মেদিনীপুর, হুগলী জেলার কিয়দ্দংশ জুড়ে বহুল তুষু গান ছড়ানো আছে। সেই বিপুল গানের সম্ভার সংগ্রহ করার আথিক সামর্থ আমার নেই। কিন্তু গানগুলি সংগৃহীত হওয়া অত্যন্ত দরকার। শুধু জেনেছি 'বাংলাদেশের সঙ প্রসঙ্গ' খ্যাত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এশিয়াটিক সোসাইটি (কলকাতা) থেকে এ কাজ করছেন। তাঁর চেষ্টা সুসম্পূর্ণ হোক এই কামনা করি। তুষু গানগুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এগুলি সংগৃহীত হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের, বাঙালী জনমানসের এক অক্ষয় পরিচয় রক্ষিত হবে॥

স্কুলডাঙ্গা
বাঁকুড়া।

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

আলোচনা সূচী

পঞ্চদশ প্রদীপ সমন্বিত মাটির তুষু মূর্তি (পুরুলিয়া)

প্রদীপ সজ্জিত তুষু খলা : বাঁদিকে একানে (একতল), ডান দিকে ত্রিতল মৎ নির্মিত ত্রয় খলা (বাঁকড়া)

কুলুঙ্গিতে তুষু। মেয়েরা তুষু পূজা করছে গানের মাধ্যমে (পুরুলিয়া)

পৌষ মাসে তুষু খলা বিক্রী হচ্ছে (বাঁকুড়া)

চৌদল বা তুষ্ ভেল্লা তৈরী করছেন শিল্পী (বিষ্ণুপুর)
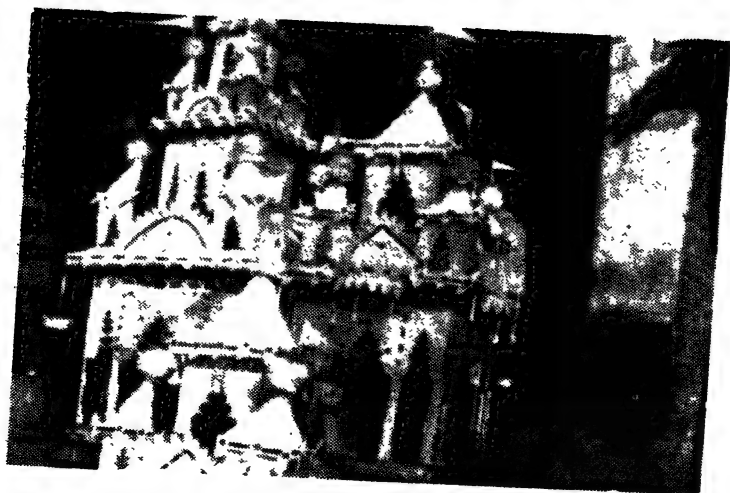
বাজারে সাজিয়ে চৌদল বিক্রী হচ্ছে (বিষ্ণুপুর

তুষু মূর্তি মাথায় উদ্দাম নৃত্যসহ মেলায় যাত্রা । পোরকুল

ময়ূরবাহনা তুষু মূর্তি নিয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা চলেছেন (পোরকুল)

পৌষ সংক্রান্তির ভোরে পঞ্চ ভুষু মূর্তি বিসর্জনের পূর্ব মুহূর্ত (বাঁকুড়া)
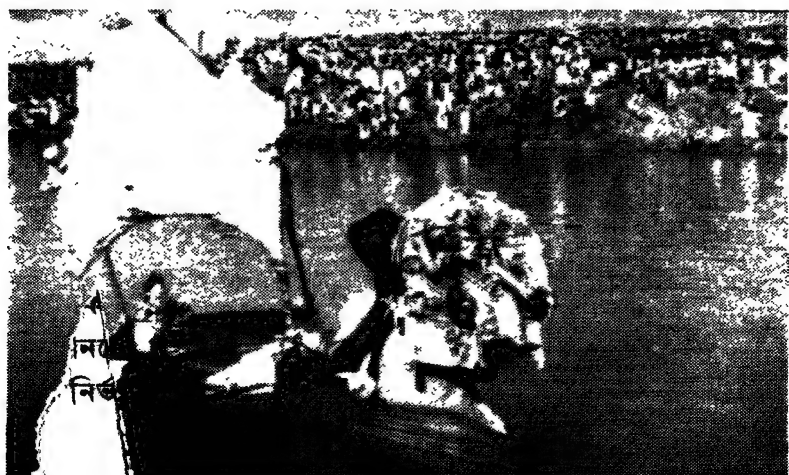
ংসাবতী নদী গর্ভে চৌদল সহ মুর্তি বিসর্জন (বাঁকুড়া)
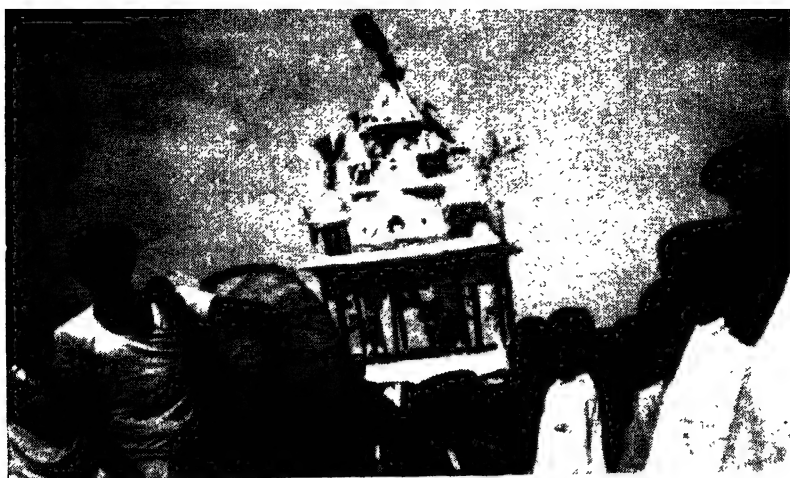
টুসুর নবরত্ন ভেলা ও বাদ্যি বাজনা সহ বিসর্জন যাত্রার দৃশ্য (পোকাবাঁধ)

টুসু বিসর্জন যাত্রার দৃশ্য (মান   ক্যারকুল)

১. কথারম্ভ

উজ্জ্বল জীবনের চিত্র এখনও গ্রাম পরিধির মধ্যে বর্তমান। আশায় উজ্জ্বল, ভালোবাসায় উজ্জ্বল। মানুষের মৌল পরিচয় ঐ আশার মধ্যে, ভালোবাসার মধ্যে। গ্রামীণ জীবনে দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, আছে অশিক্ষার অন্ধকার, কিন্তু এই সব কিছুর সম্মিলিত শক্তি এখনো গ্রামীণ মানুষকে অমানুষ করে ফেলেনি, গড়ে তোলেনি কৃত্রিম অবয়বে। আশা ও ভালোবাসার আদি সত্তা যে কত গভীর ও বিস্তৃত ভাবে আছে গ্রাম সমাজে তার সহজলভ্য পরিচয় পাওয়া যায় ব্রত, আচার ও উৎসবের মধ্যে। কুমারী বা সধবা (ও কিছু পুরুষের) আচরণীয় ব্রতগুলি কী এক গভীর নিয়মে বেঁচে রইলো গ্রামের লোকধারার মধ্যে, সে বিস্ময় সঙ্গত কারণেই আমাদের আলোড়িত করে। এই ব্রতগুলির প্রাণ বহু শতাব্দীর এবং এগুলির প্রবহমান ধারা দেশের সর্বত্র কম বেশী পরিলক্ষিত হয়। কুমারী বা সধবা নারী যখনই কোন ব্রত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে, তখনই দেখতে পাওয়া যায়, এক সুগভীর সত্য যে, কিছু আশা আকাঙ্ক্ষায় তার মন আন্দোলিত হচ্ছে এবং নিবিড় ভালোবাসায় সে সিক্ত করে দিচ্ছে আচার অনুষ্ঠানের তুচ্ছ বিষয়-গুলিকে, অকিঞ্চিৎকর উপাদানগুলিকে।

ব্রত অনুষ্ঠানের রূপ ও স্বরূপ অন্বেষণের সময় আর একটি মহৎ লাভ হয়। এর ফলে মানুষের কাছাকাছি আসা যায়। 'যে আছে মাটির কাছাকাছি' সেই অকৃত্রিম মানুষের সত্য স্বাভাবিক পরিচয় পাওয়ার আনন্দের তুলনা হয় না। গবেষণার অন্যান্য ক্ষেত্রে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার নির্ভর নিরন্তর শুষ্ক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে কীটের মতো

নিরত থাকতে থাকতে যে গবেষকদের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে তারা যদি মাটির বুকে পা ফেলে মাটির মানুষের জীবনচিত্র অন্বেষণ করতে আসে তখনই ভালোভাবে বুঝতে পারা যায়, এই ধরনের মানব-কেন্দ্রিক সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক গবেষণার মধ্যে এক অতলান্তিক আনন্দ আছে। আমরা মনে করি দারিদ্র্য মানুষকে অমানুষ করে তোলে; কিন্তু গ্রামজীবনে দেখতে পাই যেখানে যত অভাব সেইখানেই কল্পনার ঐশ্বর্য তত বেশী। নিরাশার অন্ধকার যেখানে নিশ্ছিদ্র সেইখানেই আশার আলো মানস-আকাশে ততই দীপ্যমান। খরায় রুক্ষ রাঢ় অঞ্চলের মাটি, অনাবৃষ্টির ভয়ংকরতা, দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসিয়ে রেখেছে মানুষকে তবু রাঢ় অঞ্চলের, মল্লভূম ও মানভূম অঞ্চলের মানুষ প্রাণের মণিকোরক থেকে বেঁচে থাকার প্রাথমিক সত্যস্বরূপটি হারিয়ে ফেলেনি। এখানের মাটি যত শুষ্ক নদী যত জলহীন, অরণ্য যত অফলা, এখানের মানুষের মনে তত রস, তত সুর, তত গান।

মাটিকে পুড়িয়ে এরা পরিণত করেছে টেরাকোটার সৌন্দর্যে। কোয়ালি গান, ভাদু গান, গিন্নীপালনের গান, বিবাহ সংগীত, আদিবাসীদের গান, ঝুমুর, ইঁদ, বাঁধনা, পট সংগীত, রামায়ণ গান, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতির অবারণ উৎসারের মধ্যে সেই রসের স্রোত, সুরের সুরধুনী। তুষু ব্রত ও তুষু গানের খোঁজ নিতে গিয়ে আমি প্রথমেই স্নান করেছি সংগীতের সহস্র ধারায়। তারপর জেনেছি ব্রত ও উৎসবের পরিচয়। গান আর ব্রত-আচার এখানে অভিন্ন, অভিন্ন গান আর উৎসব। কোন একটি মাত্র তুষুমেলায় উপস্থিত হলেই বোঝা যায়, সুরের গুরু লক্ষ মানুষের অন্তরে বাস করে গানে গানে মাতিয়ে দেয় মানুষের প্রাণকে।

কথা বলতে মানুষ ভালোবাসে। আর গানের সুরে কথা বলতে আজও ভালোবাসে গ্রামের মানুষ। মনের গভীর ভাব ভাবনা

ভাষায় ব্যক্ত করতে গেলেই তাতে সুর লাগে, ঐ নান্দনিক সত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন, কিন্তু তুষু গানের গ্রামে এসে দেখা যায়, যে কোন কথা, গভীর বা অগভীর, সব কথাতেই সুর এসে যায়। তুষুর মধ্যে কথা আর সুর অভিন্ন। কখনোই মনে হয় না আরোপিত। সমতল ভূমিলগ্ন কৃষি জীবনে সুরের স্রোত অনুচ্ছলিত শান্ত ছন্দে চলেছে। চলেছে একই সঙ্গে লৌকিক পৃথিবীর দিকে দিকে এবং অলৌকিক জগতের উর্ধ্বায়নে। ব্রত অনুষ্ঠান ও ব্রত গানের মধ্যে স্বর্গ ও মর্ত্য একাসনে বসেছে।

আমরা যারা ব্রত বা উৎসবকে দূর থেকে দেখেছি, যারা ব্রত পালন করিনি বা উৎসবপতি নই, আমরা যদি সভ্যতাগর্বী ধরণ-ধারণটিকে ফেলে দিতে না পারি আমাদের দেহ ও মন থেকে, তাহলে আমরাও ব্রত ও গানের সবটুকু মাধুর্য আস্বাদন করতে পারবো না। তুষু গান সারা পৌষ মাস ধরে শোনা যায় এখানে ওখানে নানা সময়ে নানা অবস্থায়। ট্রাকের পিঠে চড়ে চলেছে একদল মজুর ও কামিন, তারা বাতাস কাঁপিয়ে তুষুগান ছড়িয়ে যাচ্ছে। বাসের মধ্যকার ভিড়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে, তারই মধ্যে হঠাৎ তুষু গানের সুরেলা কণ্ঠ আরাম নিয়ে এলো সুদীর্ঘ সময় ধরে। হাট থেকে ফিরছে একদল ছেলেমেয়ে, তুষু গানের সঙ্গে পা ফেলতে ফেলতে, আর নিস্তব্ধ অরণ্যপ্রকৃতি শুনছে সে গান। কোন রাজনৈতিক দলের মহাসম্মেলন, নেতাদের বক্তৃতা দিতে কত দেরী কে জানে, উদগ্রীব হয়ে বসে থাকা মানুষের জমায়তের মধ্যে কোন এক প্রান্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো তুষু গানের আবেগে। খামারে খামারে ধান ঝাড়াইয়ের কাজ চলেছে তুষু গানের ছন্দে। এমন কি মণ্ডপ চলেছে টালমাটাল পা ফেলে তারও মুখে ঝরছে অস্ফুট তুষু গান। বারাঙ্গনা পল্লীতেও সাজসাজ রব পড়ে যায় তুষুর

'জাগ্রণী'[১] গান গাইবার উৎসাহে।

তুষু গান আর গানে তৃপ্ত জনগোষ্ঠী এমনি করেই মিলে মিশে যেখানে আছে সেখান থেকেই আহরিত হয়েছে আমাদের দীর্ঘ-নিবন্ধের উপাদান ও গীতিনিদর্শন। হয়তো পরবর্তী কালে এর অনেক রীতি ও ঢঙ, উপাদান গ্রহণ ও আনন্দ সঞ্চারের নিয়ম পাল্টে যাবে, কিন্তু একটি সার্বজনীন সত্য যে এই নিবন্ধের মধ্যে ধরা রইলো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে বাঁকুড়া জেলার তুষু-পরিচিতিই এই গ্রন্থের মৌল সত্য।

বেঁচে থাকার জাদু যেখানে সুন্দরের হাতে থাকে সেখানে ভয় করার কিছু নেই। ভারতবর্ষে নানা ধর্ম এসেছে সুন্দরের হাত ধরে। আর্য, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মের নিজস্ব সৌন্দর্য শিক্ষা ছিল এবং আজও আছে। ব্রতচারণার মধ্যে ঐ সৌন্দর্যচর্চা ও সৌন্দর্যচর্যার অপূর্ব অবকাশ ঘটেছে। কী গভীর নিপুনতায় এখনো তুষুর থলা, আলোখলা, চৌদল, তুষুর ভেলা তৈরী হয় গ্রাম নগর গঞ্জ দেশ জুড়ে! বিষ্ণুপুরের তুষুর ভেলা, বাঁকুড়ার আলোখলা সত্যিই অপূর্ব। বিষ্ণুপুরকে যে City of Art বলা হয়েছে তার একদিকের প্রমাণ পৌষ সংক্রান্তির দুদিন আগে বিষ্ণুপুরে গেলেও পাওয়া যায়। আর বাঁকুড়া শহরের কুমোরের দোকানে দোকানে সারা পৌষ মাস ধরেই তুষুর খলা সাজানো থাকে। ইদানীংকালে দক্ষিণ বাঁকুড়ায় মাটির তুষু মূর্তিও তৈরী হচ্ছে যত্ন সহকারে। এরই সঙ্গে অপূর্ব বিন্যাস ঘটেছে আলিম্পনের। তুষুর সরা বা ঘট আলপনার সুচারু রেখায় ভরিয়ে দেওয়া হয়। গৃহে গৃহে তুষু পাতার স্থানটিকেও আলপনার সৌন্দর্য দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়। সুন্দরের

---

১ পৌষ সংক্রান্তির আগের দিনের গান ও উৎসব অনুষ্ঠানকে এরা 'জাগ্রণী' (জাগরণী) বলে। বিষ্ণুপুরে একথা আমরা শুনেছি।

প্রকাশ এমনিভাবেই তুষুকে কেন্দ্র করে ঘটে চলেছে শহরের নোংরা বস্তিতে বা গ্রামের অপরিচ্ছন্ন চৌহদ্দীর মধ্যেও।

তুষু ব্রত ও গান অমর। লক্ষণ দেখে মনে হয়েছে কোন দিনই এই গানের স্রোতধারা মরে যাবে না। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি শক্তির থেকে দশ হাজার গুণ বেশী সম্মিলিত সৃষ্টি শক্তি এই সব তুষু রচয়িতা ও তুষু গায়ক-গায়িকাদের। তুষু গানের অমৃতের সন্ধান যতটুকু করা যায় তাতেই পাওয়া যায় অসীম আনন্দ। পরিশেষে জানাই, তুষু আরও ব্যাপকভাবে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হওয়ার দরকার। কারণ অতীতের অজস্র অসংখ্য তুষু গান হারিয়ে গেছে এবং বর্তমানেও হারিয়ে যাচ্ছে। কতটুকুর সন্ধান আমরা জানি? আমরা যে জানি না, সে জ্ঞানটুকুও আমাদের নেই।

২. তুষু অন্বেষণের পালা

অবশেষে পরমা সুন্দরী মেয়েটি গান ধরলো। সুসজ্জিত মঞ্চ, আলো ঝলমল। শীতকম্পিত সন্ধ্যা। বাছাই করা শ্রোতৃমণ্ডলী, মঞ্চ থেকে 'জননী জন্মভূমি' গীতি আলেখ্যটি পরিবেশন করছে বাঁকুড়া শহরের অভিজাত সংসারের তরুণ তরুণীরা। মাথার খোঁপায় টকটকে গোলাপ ফুল গাঁথা রূপবতী মেয়েটি হারমনিয়াম বাজিয়ে, একের পর এক গান গেয়ে গেলো। কখনও একক কণ্ঠে, কখনও সমবেত স্বরে। গানের কিছু অংশ টানা সুরে, কিছু অংশ ছড়ার দ্রুত ছন্দে গাওয়া হচ্ছিল। সুরের সরল ঝর্ণাধারায় প্লাবিত হচ্ছিল শ্রবণেন্দ্রিয়, মন বলছিল এ জিনিষ আগে কখনো শুনিনি। পরিবেশিত সমস্ত গানটি এই রকম—

টানা সুর উঠ উঠ উঠ তুষু, উঠ্ করাতে এসেছি
তোমারই সব সবসংতি তোমায় পূজতে বসেছি।
চারিদিকে প্রদীপ বলয় মাঝখানে তুষুরানী
হলুদ রাঙা বরণ তোমার চাঁদবদন ঐ মুখখানি।

ঘসো ঘসো চন্দন ঘসো, বেলা হল পুরি গো।
আম কাঁঠালের বাগান দেবো ছায়ায় ছায়ায় যেতে গো
আম খেয়ে আম খিড়াই ফেল্‌লো বড় নদীর মাঝখানে।
বড় নদীর হুড়হুড়ানি ছোট নদীর ফেনানি।
ফেনান ছেড়ে বান পড়েছে তুষু কেমন আছিস গো।

ছড়ার সুর তুষ্ তুষ্‌লা ক্যান্ তুষ্‌লা, তুষলা গো রাই,
তোমার দৌলতে আমরা ছব্‌ড়ি পিঠা খাই।

ছব্‌ড়ি লব্‌ড়ি গাং সিনানে যাই,
গাংয়ের জলে রঁাধি বাড়ি মকরের জল খাই।

চার মাস বর্ষা পখর্‌ণা যাই,
পখরণায় দেখে এলাম ছুয়ারে মরাই।
সেই মরাই ভঁাঙলো, ভাইয়ের বিয়া লাগলো
লাগুক লাগুক ভাই'র বিয়া, বসুক ডালে,
ডাল ভাঙব, ফুল তুলব, সে ফুল না তলে।
সে ফুল না তলাতুলি আলোনো আলোনো,
আমাদের তুষুর কানে সাত তোলা সোনা গো,
সাত তোলা সোনা।
সাত তোলা সোনা নয় মা, সাত কড়াকড়ি,
তাই দিয়ে দিয়ে পূজি আমরা সোনার পূজুরী গো
সোনার পূজুরী

টানা সুর আচিরে পাচিরে পদ্ম, পদ্ম বই আর ফোটে না।
তুষুর হাতে জোড়া পদ্ম ভ্রমর বই বসে না।
ভ্রমর এলো খাতা খাতা ও তুষু তুই ফুল পাতা।
এমন দেখে ফুল পাতাবি চলে যাবি কলকাতা।
কলকাতা যে গেছলেন তুষু কি কি সন্দেশ উঠেছে?
অঁাকাবাঁকা জিলপী খাজা ফুলন তেলে ছেঁকেছে।
সরু ঝাজরা মিহিদানা এসেন্‌সেতে ছেঁকেছে।

ছড়ার সুর মুচকন্দা ফুল তুলতে গেলাম হেথা কি সেথা,
শিবের সাথে দেখা হল এক মাথায় জটা।
হায় শিব, হায় শিব কিসের এত গরব,
আইবুড়ো মেয়েছেলের বিয়া দিতে নারো গো,
বিয়া দিতে নারো।

টানা সুর   কত রাজা মহারাজা করেছেন তুষু পূজা।
এক হাতে সন্দেশের ডালগা, এক হাতে চাঁদমালা গো,
এক খুরিতে আতপ চাল মা, এক খুরিতে দুধ গো।

ছড়ার সুর   আজ থাকো মা নন্দরানী আনন্দ হয়ে
আবার তোমায় পূজব আমরা যা পাই তা দিয়ে গো
যা পাই তাই দিয়ে॥

বাটা চন্দনের মতো গায়ের রঙ, সাদা সিল্ক শাড়ীর চওড়া লাল পাড় ঘিরে আছে, গোলাপের রক্তিমাভায় জড়ানো ঐ শিল্পী শান্ত সমাহিত ভঙ্গিতে গান গাইছিলো, আর আমার মন ভাবছিল, তুষু গানে এত ঐশ্বর্য![২]

তুষু সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের লোকসংগীতের রূপ ও স্বরূপ বহন করছে। সেই গান যে বুদ্ধিজীবীদের সম্মেলনে এ ভাবে পরিবেশন

করা যায় জানা ছিল না। তুষুর সম্বন্ধে আগ্রহ জেগেছিল প্রথমতঃ পঠন-পাঠনের মাধ্যমে, কিছু বই পড়ে প্রবন্ধ হাতড়ে। বাঁকুড়ায় চাকুরী করার কালে দীর্ঘ আট বছর ধরে কিছু তুষু সঞ্চয় করেছিলাম, বাঁকুড়া শহর ও বিভিন্ন গ্রাম থেকে। কিন্তু পৌষের মাঝামাঝি কোন এক শীতার্ত সন্ধ্যায় ঐ আনুষ্ঠানিক তুষু সংগীতে কান পেতে মন ভরে গেল। নতুন উৎসাহে সংগ্রহ করতে শুরু করলাম তুষু গান, সুর সহ গায়ক গায়িকাদের মুখ থেকে।

তুষু পূজার মাস পৌষ মাস। মকর সংক্রান্তির আগের দিন অর্থাৎ তুষু ভাসানের আগের দিন বাঁকুড়া শহরের রামপুর অঞ্চলে তুষু পূজার নিয়মাবলী দেখতে গেলাম।[৩] তুষুর খলা পেতে পূজা ও গান হচ্ছে একটি বাড়ীতে। তুষু খলার প্রদীপগুলি জ্বলছে। পাশে থালায় মুড়ি, চিড়া ভিজে, আতপ চাল, আদাকুচি, রম্ভা, আপেল, লেবু, চিনি, দই, দুধ দিয়ে ভোগ সাজানো। গান করছিল চারটি ছোট মেয়ে ও একটি ছোট ছেলে।[৪] তালে তালে দুলে দুলে খালি গলায় সুর টেনে টেনে গান করছিল। কোন যন্ত্র বা কোন প্রকার 'সংগৎ' সাহায্যের দরকার হয়নি এদের। টেনে টেনে ছড়া বলার মত। আধা গান, আধা ছড়া। প্রতিটি চরণ দুবার করে গাওয়া হচ্ছিল। একটি মেয়ের উচ্চারণ ছিল সম্পূর্ণ 'বাঁকুড়ি', অন্যদের শুদ্ধ উচ্চারণ, কিছু 'বাঁকুড়ি'। তার মধ্যে এক থালা পিঠে এলো, রাখা হল তুষুর পাশে। তুষুর খলা টাটকা গাঁদা ফুলে ভরা। তুষু খলার গড়নবৈশিষ্ট্য আছে, দুতলা মাটির সরা, প্রতি তলায় গোল সারি বসানো মাটির প্রদীপ।

৩ সঙ্গে ছিলেন সাধনা নন্দী। বাঁকুড়া জিলা সারদামণি মহিলা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

৪ ওদের নাম—কুমারী রমা রবাট (১২), চন্দনা নন্দী (১০), বৈশাখী নন্দী (৮), বিদ্যাসুন্দর নন্দী (৮)।

৭+১৩ মোট কুড়িটা প্রদীপ। গানগুলি ঐ বালিকা বালকেরা গেয়ে গেল পর পর—

উঠ উঠ উঠ তুষু, উঠ্ করাতে এসেছি,
তোমার উপর দাসীগুলি পূজিতে সব বসেছি।

উপর পাতা নাময় পাতা মাঝ পাতাতে দারোগা,
ও দারোগা পথ ছেড়ে দাও তুষু যাবে কলকাতা।
তরল দেখে উঠলাম গাছে তলাতে কে লোক আছে।
ডালো ভাঙিলাম ফুলো তুলিলাম, ফুলে করলাম খঞ্জরি,
এ খঞ্জরি কে বাজাবে তুষুর ব্যাটা শ্রীহরি॥

বাড়ীর ভিতর বেগুন গাছটি বেগুন খেল বাঁদরে,
বাঁদরকে কি দোষ দেব মা ঝাঁপ দিব দামোদরে।
ও দামোদর, ও দামোদর, কোন্ ঘাটে সরু বালি।
আমার তুষুর বিয়ে দেব যার ঘরে সোনার ঝারি॥

আচিরে পাচিরে পদ্ম নীলপদ্ম বই তুলো না।
তুষুর হাতে জোড়া পদ্ম ভ্রমরা বই বসে না॥

সোন্নার কদম তলায় পায়রাকুল ওড়ে গো
পায়রা লয় মা পাখি লয় মা, তুষু খেলা করে গো।
খেলো না খেলো না তুষু ভাঙা পালকি দেব না,
ময়রা মশায় পালকি দিল শহরে বেড়াতে গো।
আকালে পুষিলাম পায়রা দুধ ভাতো দিয়ে গো।
সকাল হল গেলি পায়রা মনের দুঃখ দিয়ে গো॥

ই ডালের ভোমরা উ ডালকে যায়,
ডালে বসে ভোমরা লিচু ফল খায়।
লিচু ফল খেয়ে ভোমরা ছড়ি ছড়ি যায়।

ময়রাদের ছেলেগুলো কুড়ি কুড়ি খায় গো কুড়ি কুড়ি খায়।
বামুনদের ছেলেগুলো কুড়ি কুড়ি খায় গো কুড়ি কুড়ি খায়।

বেনাদের চালেতে ভাই পাকা কুন্দরী,
বেনাদের বউ আসছে অতি সুন্দরী।
অতি লয় অতি লয়, সব সইতে পারি,
নাক তুলে তুলে কথা কয় মা তার জ্বালাতে মরি।

বোষ্টমদের চালেতে.........জ্বালাতে মরি।
বাগদীদের.................জ্বালাতে মরি।

আমার টুসু উপার গেল কালো পাথর কাটাতে।
অত কেন দেরী হল অজয়ে বান পড়েছে।
অজয়ে বান কল কল মিঠাই ভেঙে জল খাবো।
সব সখীকে পার করিতে লিব কানে সোনা গো।

আমার টুসুর কালো চুলে ধারে ধারে গেঁদা ফুল।
ছোট করে পা ফেলিবি যেতে হবে কোতুলপুর।
কোতলপুরের হাটে গিয়ে কিনতে হবে গুড়খাড়া।
আমার টুসু খায় না খাড়া বাজারেতে হাত নাড়া।

এক ভরি কাঠ দু' ভরি কাঠ কাঠে আগুন লাগাবো,
যখন আগুন পাগল হবে সীতা কেটে ফেলে দিব।
সীতা গেলে সীতা পাবো, রাম গেলে কোথায় পাবো।
সীতা ছিলেন অশোক বনে রামকে লিয়ে ঘর যাবো।

আমার টুসু পান খুঁজে পান কোথায় পাবো গো,
বাটায় আছে ডবল খিলি বার করে এনে দাও গো।
উয়ার টুসু পান খুঁজে পান কোথায় পাবো গো,
আমার টুসুর পান চিবাটা উয়ার টুসুক্ দাও গো।

আমার তুষু শুতে খুঁজে কিবা শুতে দেবো গো
সোনার খাটে হেলন দেলন রূপার খাটে পা গো।
উয়ার তুষু শুতে খুঁজে কিবা শুতে দেবো গো
ভাঙা খাটে হেলন দেলন জুমড়া[৫] খাটে পা গো।

আমার তুষুর লাউ ধরেছে উরুলি ঝুরুলি গো,
উয়ার তুষুর নাকটা কেটে বাজাবো মুরুলি গো।

ঘস ঘস চন্দন ঘস দিব মায়ের চরণে,
মা দিয়েছেন মাথা বেঁধে, বৌ দিয়েছেন ফুল গুঁজে।
সাধের ননদ কাঁনছো কেন করবরীর ডাল ধরে।
করবরী খেয়ে মরি তবু মরণ হল না।
কি করে ঘর যাবো সরকার মেঘ ডুবে আঁধার হল।
আঁধার ঘরে সাঁঝ গুনিলাম ভাসুর বললো জানি না।
ও ভাসুর তোর পায়ে পড়ি বড় দিদিক বলিস না।
বড় দিদিক বললে পারে আমায় ঘরে রাখবে না।
বারণ করলো ছোট ননদ, তোর ভায়ের ঘর করবো না।

এমনি করে একের পর এক গান[৬] গেয়ে গেল ঐ বালক-বালিকারা। ছলে ছলে গান যেমন লক্ষণীয় তেমনি লক্ষণীয় তাদের স্মৃতিশক্তি। তুষু গান জনমানসের স্মৃতিনির্ভর গান, এর কোন লিখিতরূপ নেই। যদিও একালে ছোট ছোট বই ছাপা হয়ে বাজারে বিক্রী হয়, তবু সে সব বইয়ে যা গান আছে তার সহস্র সহস্র

৫ জলন্ত, পোড়া।

৬ ঐ বালক বালিকা চতুষ্টয় আরো গান গেয়েছিল, বাহুল্য ভয়ে সেগুলি এখানে উদ্ধৃত হয়নি, কারণ 'পরিশিষ্ট' ভাগে সেগুলি আগেই সংগৃহীত ও সংকলিত হয়েছিল। এমন অনেক গান আছে যেগুলি বিভিন্ন স্থান থেকে কমবেশী পরিবর্তিত পাঠে একাধিক পেয়েছি।

গুণ বেশী আছে জনমানুষের কণ্ঠে, নারী পুরুষের স্মৃতিতে। প্রত্যেক বছরই নতুন নতুন গান রচিত হয়। পুরানো গানের অনেকগুলিই হয়তো হারিয়ে যায়, কিন্তু গানের স্রোতে কখনও ভাঁটা পড়ে না। সভ্যতার বাহ্যিক আকর্ষণে এখনো তুষু গানের স্রোত বাধিত হয় নি, বা শুষ্ক হয়ে যায় নি। বাঁকুড়ার লোক-সংগীতের এই বৈশিষ্ট্যও অবশ্য লক্ষণীয়।

সাজানো মঞ্চ থেকে সাধারণ পাড়ায় তুষু গানের অন্বেষণ করতে করতে আমরা পরের দিন পৌঁছোলাম পোরকুলের মেলায়। এ মেলার পরিচয় না পেলে তুষু গান ও পূজা ও উৎসবের সমগ্র রূপ দেখার ব্যাপারে অনেকাংশে অপূর্ণতা থেকে যেত।

৩. তুষু সমুদ্র পোরকুল

ঘরে পরিবারে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে শহরে তুষু পূজার সারা পৌষ মাস ব্যাপী অনুষ্ঠানের ছোট ছোট গীত ধারা চারি-দিক থেকে অশ্রান্ত অসংখ্য রেখাপথে নেমে এসে এক জায়গায় মিলিত হলে কী উত্তাল তুষু-সমুদ্র তৈরী হতে পারে তা ধারণায় আনতে পারবেন তাঁরা যাঁরা পোরকুলের[৭] মত কোন একটি তুষু মেলায় গেছেন। এই মেলা একদিনের মেলা। মকর সংক্রান্তির দিন। পাড়ায় শুনেছি মেয়েরা, ছোট ছোট কুমারী মেয়েরা তুষু গাইছে, সঙ্গে দু'একটি বালক। কখনো বা দিদিমা ঠাকু-মারা তুষু গান শেখাচ্ছেন মিষ্টি স্মিত আনন্দে। কিন্তু পোরকুলে কংসাবতী নদীখাতে কয়েক ঘণ্টার জন্য সমুদ্রসম্ভব উত্তালতা সৃষ্টি হল তুষু গানের সঙ্গে নৃত্য এবং বিচিত্র বাদ্যের সমাহারে। প্রায় ২৫/৩০ হাজার নারী ও পুরুষের মিলিত মেলাপ্রাঙ্গণ আনন্দের আবেগে আটলান্টিক মহাসাগরের মতো দুলছিল। এখানে এলে চোখ পাতিয়ে দেখতে পাবেন অজস্র রূপচিত্রশ্রেণী। কান পেতে শুনবেন অনন্ত শব্দতরঙ্গ গানে বাদ্যে কল-কোলাহলে। সুরের মেলা দেখেছি শান্তিনিকেতনে, দোল-পূর্ণিমায় সমগ্র শান্তি-নিকেতনবাসী ছাত্রছাত্রীদের মিলিত সারিবদ্ধ গান নাচ, কিন্তু সবই সুনিয়মিত পূর্ব-নির্ধারিত। সুরের মেলা দেখেছি জয়দেব-কেঁদুলীতে। তিন দিন ধরে এখানে ওখানে প্যাণ্ডেলে পথে প্রান্তরে বাউল গানের আসর, আকাশে বাতাসে সুরের শব্দের

---

৭ তুষু গানের মধ্যে পোরকুল (পরকুল)-এর উল্লেখ আছে। 'পরিশিষ্ট' অংশে সংকলিত ১২৩, ১৩৯ সংখ্যক গানে পোরকুল মেলার নাম এসেছে।

ইন্দ্রজাল। তারও নিপুণ নিয়ম আছে, আছে যন্ত্ররাবণ মাইকের চীৎকারে আধুনিকতার আড়ম্বর। কিন্তু পোরকুলে হাজার হাজার নারী ও পুরুষ একই গান গাইছে এলোমেলো সুরে, কত তার ভাব, কত তার কাহিনীসূত্র, কত তার উদ্দাম প্রকাশভঙ্গি। নিয়ম নেই, নিষেধ নেই। উদ্দাম প্রাণের উন্মত্ত আনন্দ প্রকাশের অনিয়মেই সব কিছু, দূর সীমা পরিসীমা, সীমাহীন অসীমতা।

পোরকুল! বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণপ্রান্তে কংসাবতী নদীপ্রান্তের গ্রাম। বাঁকুড়া শহর থেকে প্রায় ষাট কিলোমিটার। বাঁকুড়া শহর ছাড়িয়ে বাস চলেছে। সকালেই বেরিয়ে পড়েছি। ছোট সোয়েটারের উপর হাতাওয়ালা বড় সোয়েটার চড়িয়ে। কাঁধে টেপ রেকর্ডার ঝুলিয়ে, বড় সোয়েটারের আড়ালে লুকিয়ে নিয়েছি। সামনে ভাঙা লাল থালার মতো সূর্য উঠছে অদূরে আশুথ গাছের ফাঁকে। গোলাপী লাল সূর্য। শহরের প্রান্তে বেড় দেওয়া দ্বারকেশ্বর নদ। নদীর ব্রীজ ছাড়িয়ে ধলডাঙার মোড়। যেতে হবে খাতড়ার পথে। দামোদরপুর, ভগবানপুর, তারপর সুসুক্‌পাহাড়ীর হাট। বাংলা ও গোবিন্দপুরের কাটাখাল পার হল বাস। এলো শিলাই নদী। হাতিরামপুরের মোড়, সুপুর-চটি এবং তারপরেই খাতড়া। দক্ষিণ বাঁকুড়ার খ্যাত শহর। খাতড়ায় ঢোকার আগেই দূর থেকে চোখে পড়ে রাস্তার বাঁ দিকে দাঁড়ানো একটি পাহাড়, পাপড়া গ্রামের মশক পাহাড়। এই অনতিউচ্চ পাহাড়টিকে বাঁ দিকে রেখে বাস খাতড়া ছেড়ে যাবে পোরকুলের দিকে। বাস খাতড়া পর্যন্তই রোজ যায়, আজ মেলার জন্য যাত্রী-বোঝাই চলেছে পোরকুল পর্যন্ত। লরীর ধুলো ওড়ানো গর্জিত গতিময় দৃশ্যই বেশী। সাইকেল, গোরুর গাড়ী, পায়দল। খাতড়া থেকে ছ'মাইল লাল ধুলোর চওড়া পথ।

পোরকুলে প্রবেশের আগে গ্রামপ্রান্তে বাস থামলো গয়লা ডাঙায়। একদল মানুষের জটলা রাস্তার ধারে। আলাপ হল ক্ষিতীশচন্দ্র পাণ্ডার সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম—

: পোরকুলে কেন মেলা বসে ?

: আজ্ঞে, তার কোন ঠিক লাই। বাপ ঠাকুর্দার সম' থেকে দেখে আসছি।

: কোন কারণ কাহিনী নেই ?

: হঁ, আছে আজ্ঞে।

: কি, বলুন দেখি, শুনি।

: একজন জমিদার রাজা[৮] মানুষ। অনেক সোনার টাকা, রূপার টাকা দিয়ে দিয়ে কি, গড়িয়ে ছিল একটা লাঠি। সেই লাঠিটো নিয়ে কলকাতা গিছলো। গঙ্গা স্নান করার সময় লাঠিটা হারাই গেল। তখন দুঃখ করে উ জমিদার বললেক কি, মা গঙ্গা আমি চান করতে এলম, আর আমার লাঠিটা হারাই গেল জলে! তারপরে একদিন স্বপ্নে মা গঙ্গা বললেক কি, তুই পরকুলে যা, উখানে কংসাবতী নদীতে স্নান করগে যা। মকরের দিন সান করে উ লাঠিটো ফিরাই পেল উ জমিদার। তাতে বিশ্বাস গেল সবাই যে মা গঙ্গা ই ঘাটে প্রবাহিত হয়েন। সেই থিকে বিশ্বাস, ইখানে চান করলে গঙ্গা স্নানের পুণ্য হয়। তাই মেলা।

মেলা দেখে ফেরার সময় যখন ধনু মাহাতোর বাড়ীর কাঁদালে বসে কথা হচ্ছিল তখনও একই লোকবিশ্বাসের কথা বললেন ভবতোষ মাহাতো।

গয়লাডাঙার পরেই পোরকুল। গ্রামের পথ প্রশস্ত। গ্রামের প্রান্তে মাঠের ধারে এসে দাঁড়ালাম। চোখে পড়লো অদূরে

৮ কেউ বলেছেন চৈতন্ত পার্ষদ অভিরাম গোস্বামী

মেলাক্ষেত্র। নদীপুলিনে অর্ধচন্দ্রাকারে বিস্তৃত হচ্ছে। আল দিয়ে ঘেরা ধান জমিতে গাঁথা একটা ছোট মাঠ পার হলেই মেলার চৌহদ্দী। সাধারণতঃ নদীপুলিন বলতে যা বোঝায় তা নয়। নদীখাত। কংসাবতী নদীর একটি বাঁকে উঁচু ঢালু পাড়ে মেলা বসেছে-বসছে। জলে স্নান করছে নারী পুরুষ বালক-বালিকা। মকর স্নান।

বড় বড় ভূগর্ভস্থিত পাথরের চাঁই কেটে নদীখাত। নদী নেমে গেছে বালু আর পাথর পার হয়ে সমতলের দিকে। অল্প পরিসর সুন্দর সবুজ জল জমে আছে। স্রোতহীন। তাতেই স্নান চলছে। শীত অল্প। স্নানের আনন্দ উপভোগ্য। মাথার উপর সূর্য প্রখর হচ্ছে। তখন বেলা যদিও মাত্র সাড়ে ন'টা।

শুনে এসেছিলাম শিবমন্দির আছে, শিবমন্দির দেখলাম। আছে খাঁতুরাণীর মূর্তি, মূর্তি দেখলাম। শুনেছিলাম 'ভবসিন্ধু' পাথরের কথা। দেখতে পেলাম না। নদীগর্ভে বালি চাপা পড়ে গেছে। এ বছর কোন সাধু বাবাজী বালি সরিয়ে 'ভবসিন্ধু' উদ্ধার করেন নি। 'ভবসিন্ধু' পার হওয়া এখানে এক স্মরণীয় ব্যাপার। ছুটো বড় বড় পাথর আছে পাশাপাশি। তার মাঝখানে আছে 'গলি'। খুব বড় নয় গলিটা। ঐ গলি দিয়ে গলে যেতে হয়। সেই গলে যেতে পারে যে 'আসল' কিন্তু 'বেদোরা' (বেজম্মারা) আটকে যায়। একটা তিন বছরের ছেলে গলতে গিয়ে আটকে যেতে পারে, আবার চল্লিশ বছরের মদ্দ গলে যেতে পারে। এ সবই শোনা কথা, যারা গলেছে তেমন একজন খাতড়া শহরবাসী ছাত্র জায়গাটা খোঁজ করে দেখালো, বললো এইখানে 'ভবসিন্ধু', কিন্তু নিজে গলে দেখার সৌভাগ্য বা ছূর্ভাগ্য হল না।

খাঁদুরাণীকে দেখলাম। চারিদিকে দোকান পসারীর সারি। তারই মাঝখানে জলকিনারের কাছাকাছি খাঁদুরাণী শুয়ে আছেন। নদী চড়ার পাথরের খাঁজে আটকে আছে মূর্তিটি। উর্দ্ধাঙ্গে নাকমুখ, নিম্নাঙ্গে যোনিস্থান (?) খুঁড়ে খুঁড়ে খোদল হয়ে গেছে। কতবছর ধরে শুধু হাতের স্পর্শে এই ধরণের গর্ত হতে পারে তা হিসাবের অতীত। নাক নেই বলেই কি নাম খাঁদুরাণী? দাঁড়িয়ে দেখবার মতো মূর্তি। একটি বড় সাইজের স্ল্যাবের উপর পাথর কেটে মূর্তিটি তৈরী হয়েছে। প্রায় তিন হাত লম্বা ও দু'হাতের মতো চওড়া। দশটা হাত। প্রতি হাতে আয়ুধ বা অন্যকিছু ধরা আছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, জল বৃষ্টিতে খয়ে খয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।[৯] খাঁদুরাণী দাঁড়িয়ে আছেন প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর। তাঁর মাথার উপর ছত্রাকার সাপের ফণা, অস্পষ্ট হয়ে গেছে। সাতটি সর্পফণার জোড়। খাঁদুরাণীর পায়ের কাছে ছোট গণেশ মূর্তি, আরও দুটি মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে পায়ের কাছে। সবই ঐ একই পাথরের উপর খোদাই করা। চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা খাঁদুরাণীর গায়ের উপর চাল ফুল বেলপাতা লুচির টুকরো ছড়িয়ে দিয়েছে ভক্তরা। ভক্ত নরনারী খাঁদুরাণীর মুখ ও যোনি (?) স্পর্শ করে প্রণাম করছে; বিড়বিড় করে কি প্রার্থনা করছে, কি মানৎ করছে কে জানে! মূর্তিটি কিন্তু নারীমূর্তি নয়, সম্ভবত দ্বাদশভুজ লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি।

---

৯ খাঁদুরানীর আর একটি অপূর্ব সুন্দর মূর্তি আছে বাঁকুড়া শহরপ্রান্তে এক্তেশ্বর মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি ছোট ঘরে। মূর্তিটি অবশ্য দর্শনীয়। এটি মূলতঃ দশভূজা জৈন দেবীমূর্তি, এখন হিন্দুদেবীতে পরিণত হয়েছে। আর হাড়মাসড়া গ্রামে এই ভাবেই একটি জৈন তীর্থংকর মূর্তি খাঁদারানী নামে পূজিত হচ্ছেন।

নদীগর্ভ থেকে উপর দিকে ধানমাঠের পাশে শিবমন্দির; নিতান্ত ছোট সাম্প্রতিক কালে তৈরী একটি ইটের খুপরির মধ্যে কালো শিবলিঙ্গ। ঘরের মধ্যে পুণ্যার্থী পুণ্যার্থিনীরা পূজা দিচ্ছেন, দোষ ফাঁড়া কাটাচ্ছেন। বেনেবাইদ গ্রামের বলরাম চক্রবর্তী পূজারী, তিনিও আছেন ভিতরে। তাঁর সঙ্গে এসেছেন কাঙড়াদাড়া গ্রামের প্রাইমারি স্কুল টিচার নিত্যানন্দ গুপ্ত। শিবের জন্য যে এই মেলা, তা নয়। শিবমাহাত্ম্যে গাজন মেলার ঢঙে এ মেলা নয়, বললেন নিত্যানন্দবাবু। এ মেলা সম্পূর্ণতঃ মকর-মেলা। অর্থাৎ তুষু মেলা।

এ অঞ্চলে এককালে মঠ মন্দির মূর্তির পীঠস্থান ছিল, তার নিদর্শন এখনো আছে। মেলা পরিধির পূর্বপ্রান্তে ভাঙা বাড়ীর ইস্টকস্তূপ আজও বিদ্যমান। মনে হয়, হিন্দু সংস্কৃতি নয়, জৈন-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক নমুনা এগুলি। জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা এককালে দ্বারকেশ্বর ও কুমারী নদীর মত কংসাবতী নদীর দুই তীরভূমি স্পর্শ করে বিস্তার লাভ করেছিল। সীমান্ত বাংলার অদূরে পরেশনাথ পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় জৈন তীর্থংকরদের সাধন পীঠ চিহ্নিত আছে আজও। পোরকুলের মেলাপ্রাঙ্গণের এই ভগ্নস্তূপ থেকে আর একটি প্রস্তরমূর্তি উদ্ধার করেছেন ধনু মাহাতো।[১০] তাঁর মাটির বাড়ীর ছাঁচার কাছে দেওয়ালের কাঁথের উপর বড় রাস্তার ধারে রাখা আছে সে মূর্তি। মেলা ফেরৎ সে মূর্তিও দেখলাম। ভগ্নমুণ্ড দণ্ডায়মান প্রস্তরমূর্তি। আড়াই হাত লম্বা, দেড় হাত চাওড়া। খুব সুন্দর পালিশ, এখনো মসৃণতা চকচক করছে। কালো পাথরের বৃহৎ পুরুষ মূর্তিটি নগ্ন। লিঙ্গ অটুট আছে। প্রধান মূর্তিটির দু'পাশে অন্য দুটি মাঝারি গড়নের

১০ ধনু মাহাতোর ছেলে অনিল মাহাতোর সমাধি মন্দির তৈরী করার সময় খোঁড়াখুড়ি করতে গিয়ে এই মূর্তিটি পাওয়া যায়।

দণ্ডায়মান মূর্তি, হাতে চামর (?), মাথায় মুকুট। একেবারে পাদপীঠের কাছে একটি ক্ষুদ্র পশুমূর্তি, মহিষ বলে মনে হয়। তারও নীচে বাঁদিকে হাত জোড় করে ছুটি মানুষ বসে আছে। মাথার দিকে ছু'পাশে আরও কয়েকটি মূর্তি আছে। বৃহৎ মূর্তিটিকে স্থানীয় লোকেরা বললো 'কালভৈরব'। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে, তা নয়, একটি মহাবীরের মূর্তি। বয়বৃদ্ধ হরিপদ মাহাতো বললেন-এ অঞ্চলে এককালে শিবমন্দির ও হিন্দুসংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল, সব ধ্বংস হয়ে গেছে, তাঁরও বিশ্বাস এটি 'কালভৈরব'। জৈনসংস্কৃতির নিদর্শন কেমন করে হিন্দুসংস্কৃতির দ্বারা পুনরায়ত্ত হয়েছে, তার বহুল প্রমাণ বাঁকুড়ার মাঠে ঘাটে পথে প্রান্তরে এই ভাবেই পাওয়া যায়। এক্তেশ্বর, বহুলাড়া, ধরাপাট তারই সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

মেলাপরিধির পূর্ব দিকে একটি বৃহৎ কুসুম গাছের নিচে একটি বড় নৌকা বাঁধা আছে। এখানে নৌকা? বিস্মিত হলাম। পারাপারের জন্য নৌকা ব্যবহৃত হয়। নদীর এপার থেকে ও পারে যাওয়া চলে। উজানে বা ভাঁটায় যায় না, কারণ নদী নাব্য নয়। এখন অবশ্য নদীতে জলও নেই।

অন্যান্য মেলায় যেমন হয়, বিকিকিনির হাট বসেছে সার বেঁধে। আলু মূলো কপি পিঁয়াজ বেগুন শাঁকালু থেকে আরম্ভ করে, বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া হাতি, দেশী পাকা নেবু জামির, কাঠের পাত্র, পাথরের বাসন, লোহার আসবাব সবই এসেছে। কাপড় জামার দোকান আছে। অনেক মিষ্টির দোকান। তার চেয়ে বেশি হোটেল, ভাত লুচির হোটেল। সকাল থেকেই গরম গরম লুচি ভাজা হচ্ছে; সাদা ডিম সিদ্ধ সাজানো আছে থালায়, রঙিন ডিমের 'কারী', টিন ভর্তি কপির তরকারী, আর বড় বড় লোহার কড়াইয়ে মাংসের ঝোল, দোকানে দোকানে

লোভনীয় ভাবে সাজানো। মুরগীর মাংস, ছাগলের মাংস। রান্না মাংসের ঝোলের উপর লাল থক্‌থকে সর পড়েছে। দেখলেই জিভে জল আসে। দূরদুরান্ত থেকে তুষু গানে মত্ত মানুষ আসে, চৌদল আর মূর্তি ভাসান দিয়ে পেট ভরে খেয়েদেয়ে ঘর যায়। সকালেই গরম ভাত হয়ে গেছে। কেউ কেউ শালপাতা পেতে ভাত খেয়ে নিচ্ছে। শালপাতার 'ডোংলা' (বাটির মতো দেখতে) করে মাংসের ঝোল দিচ্ছে হোটেল মালিকের কলেজ পাশ ছেলে।

কার্তনের ছোট ছোট দল বসেছে আট দশ জায়গায়। মাথার উপর সাময়িক ছাউনি। রাধাকৃষ্ণ লীলাকীর্তন নয়, রামকীর্তন—রামায়ণ গান। এখানে রামপূজার প্রচলন আছে কি না জানি না, কিন্তু রামকীর্তনের এমন আধিক্য কেন এখানে ? 'হরি হরি বল' ধ্বনি দিয়ে খোল্ করতাল্ বাজাতে আরম্ভ করলো একটি দল। স্নান সেরে মেয়েরা পুরুষেরা প্রণাম করছে কীর্তন স্থানে, কীর্তনীয়া গান গাইতে গাইতে চামরের লম্বা লোমের স্পর্শ দিচ্ছে আনত ভক্তের দেহে মাথায়, প্রণামী পয়সা নিচ্ছে। প্রণামী পয়সার বাক্সের উপর ক্যালেণ্ডার-কাটা রামসীতার ছবি রাখা হয়েছে। অন্যত্র বাঁশের খুঁটিতে ঝুলছে রামসীতার বাঁধানো 'পিকচার'।

তাঁতিবেড়া থেকে এসেছেন নিরোদবরণ পাইন, তাঁর দলবল নিয়ে। খালি গা, কালো শরীর, লম্বা, পরণে ধুতি, পায়ে পিতলের পুরানো 'নেপুর' ('নূপুর' কথাটা কেউ উচ্চারণ করতে পারলো না)। দু'হাতের বুড়ো আঙ্গুল ও তর্জনীতে দুটো দুটো চারটে ছোট ছোট খঞ্জনি বেঁধে নিয়ে অদ্ভুত তৎপরতায় বাজাতে বাজাতে নাচতে নাচতে ধুয়া ধরেছে আর একজন—'বল রামের নাম/শুনে জুড়াক

প্রাণ/নদী তরাবে নাম বল বদনে'। এখানে গাওয়া হচ্ছে 'গুহক চণ্ডালের পালা'। অন্যত্র রামকথা গাইছেন বয়াবাইদ গ্রামের বিজয়কৃষ্ণ পাত্র। পালার বিষয় 'রামচন্দ্র ও লবকুশের বাক্যযুদ্ধ'। ধুয়া চলছে—'হে রাম রাজীবলোচন'। হারমনিয়াম বাজাচ্ছেন— সত্যেন্দ্রনাথ ও জয়দেব তুলে, খঞ্জনী বিশ্বনাথ ও অসিতবরণ তুলে, মৃদঙ্গ চুণীরাম তুলে। এই আরম্ভ হল বন্দনা পর্ব—'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ গাইলে মুক্তি হয়।/ লক্ষ্মণ চূড়ামণি বন্দি, ভক্তিভাবে বন্দি রামে/ভক্তি জাম্বুবান/রামের প্রিয় ভক্ত বন্দি বীর হনুমান' —ইত্যাদি।

মেলা ধীরে ধীরে জমে উঠছে। মেলা অঙ্গন চারপাশের তুলনায় সর্বনিম্ন স্তরের ভূখণ্ডে, নদীগর্ভে। থাক কাটা জমি চারপাশ থেকে ধীরে ধীরে নেমে এসেছে। তাই দেখা যাচ্ছে চারিদিক থেকে মানুষের, নারী ও পুরুষের স্রোতের ঢল নেমেছে। এসে জমছে কাঁসাই নদীর গাবায়। মাথার উপর সূর্যতাপ চড়ছে।

রাস্তার ধারে ঘুঘনির হাঁড়ি নামানো। বৃদ্ধ বিক্রেতা বড় রসিক লোক। অদ্ভুত উপায়ে করছে খদ্দের আকর্ষণ। অভিনয়ের ঢঙে বলে যাচ্ছে কৌতুক কথা। অল্প বয়সী মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় মায়ের আঁচল ধরে হাপুস নয়নে কাঁদছে আর বলছে—

টাকা লিয়ে আমি শ্বশুরবাড়ী যাতাম গো,...ও...ও,
ওমা কুড়ার উপরে মুড়া কাপড়ে চার আনা পয়সা বাঁধা রইলো
মনে করে রাখিস গো,
ওমা আমার লাগে মনে করে ছুটি পুন্‌কা শাক পাঠাবি গো,
ওমা আমাদের চাষে যা হবেক আমার লাগে ছুটি করে পাঠাবি গো,
ওমা ছুদিন ছাড়া আমাকে আনতে পাঠাবি গো,
ওমা আমাকে ভুলে থাকিস না গো,

ওমা আমাকে মনে করবি গো,
ওমা আজকাল বিটি ছেলেরা শ্বশুর ঘর যাবার সময় যে
কাঁদে নাই গো—
ওঁয় ওঁয় ওঁয়......ওঁয়......হোঃ হো হো

ঘুঘনি বিক্রেতার এই কান্নার ভঙ্গি দেখে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ছে। বিক্রেতা মথুরানাথ কর্মকার এসেছেন লক্ষ্মী-সাগর থেকে। হাসির ঢেউ ছড়িয়ে তিনি দেড় পায়ে নৃত্য করতে লাগলেন।

'মহাকলির শেষলীলা'। সর্বনাশ! গানের ধুমে জনতার ভিড় নিবিড়। মানুষের দেওয়াল চিরে ভিতরে ঢুকলাম। সুদূর কাঁথি থেকে আগত বিজয়কুমার মণ্ডল হারমনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে গান গাইছেন। দ্রুত লয়ে, সচীৎকারে। পুনরুক্তি করছে কিশোর বয়সী অমল সাহু ও সুকুমার জানা। ঘোর কলির পর 'মহাকলির শেষলীলায়' কি হবে তারই বিবৃতিমূলক তীক্ষ্ণকণ্ঠে দ্রুত ছড়ানো গীত ধারা—

পিতাপুত্রের ভিন্ন হাঁড়ি সংসারে ঘটিবে।
বৌ রাণী হয়ে ঘরের সিনেমা দেখিবে॥
উচ্চ কুলে রূপবান ছেলে জন্ম নিবে।
জ্ঞানী না হইয়া সে যে কামেতে মাতিবে॥
নিচ কুলে মাঠে ঘাটে পিরিত্তি বিলাবে।
লাজ লজ্জা মান ভয় সব ডালি দিবে॥
মাতা পিতার আদেশ যে কেহ না মানিবে।
কোর্টে গিয়া রেজেষ্টি করে বিবাহ করিবে॥

এতো মাত্র কলির শুরু। তারপর আসবে ঘোর কলি। অতঃপর মহাকলি। মহাকলির গানে শ্রীলতার পর্দা সম্পূর্ণ ছিন্ন হল—

সপ্ত বরষের নারী যুবতী হইবে।
নবম বয়সে নারী ছেলে প্রসবিবে॥
এক মায়ের গর্ভে কন্যা অগণিত হবে।
বিয়ে নাহি হবে তাদের, লটারী হইবে॥
এক যুবার পাছে সাত যুবতী ছুটিবে।
ঘেরিয়া সকলে তারা পিরিতি করিবে॥

'মহাকলির শেষ লীলা' শুনতে শুনতে ভয় ধরে গেল। বেশ জমেছে আসর। সেখান থেকে সরে এলাম। কিন্তু তুষু-প্লাবনের খবর কি? এ মেলা তুষু মেলা অথচ তার লক্ষণ দেখছি না কেন? কেমন এক ধূপতি হতাশায় রুমাল দিয়ে শুকনো মুখ মুছতে লাগলাম। শুকনো ঠোঁটে সিগারেট ধরালাম, ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল হাতের দেশালাই। ভিড় বাড়ছে। যেন জোয়ারের জল ফুলছে।

ডগ-অ ডগ-অ ডগ্। ডগ-অ ডগ-অ ডগ্। বিপুল আলোড়ন তুলে শব্দ এগিয়ে আসছিল। ক-ট-র র-র, ক-ট ররর, কট্ কট্ কট্ করে এখানে ওখানে 'কটকটি'র শব্দ হচ্ছিল। মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল খোল করতালের লম্ফঝম্প। কখনো কোথাও ডুগ্‌ডুগির শব্দ। কিন্তু সারা মেলা কাঁপানো ড-গ-অ, ড-গ-অ, ড গ-অ কেন? মেলার পূর্বভাগে এগিয়ে আসছে শব্দ। একসঙ্গে ছুটো ধামসা বাজাতে বাজাতে একদল উন্মত্ত লোক নেমে আসছে নদীগর্ভে। তাদের মধ্যে একজনের মাথায় দেবীমূর্তি। মূর্তি ময়ূরবাহনা। তুষু ঠাকুরের মূর্তি কখনো দেখিনি, এই দেখলাম। সাধারণতঃ মাটির সরা বা একতলা দোতলা তিনতলা প্রদীপ সাজানো, ফুলে ভরে তুষু হয়। তাকে 'তুষুর খলা' বলে। এখানে দেখলাম তুষু মূর্তি। সাধারণ নারীমূর্তি। বেশবাসে

অলংকারে অবয়ব সংস্থানে দেবীগরিমার কিছুই নেই। এ দল আসছে সিমলাপাল থেকে। দলের একজন বিজয়চন্দ্র লোহার গান ধরেছে—টুসু গান—রঙ গীত –

কি রঙ উঠেছে কলিতে
যুবা বৃদ্ধা কিবা নারী মজেছে ভাই চায়েতে।
চায়ের নেশা এমনি নেশা ভুলে যায় যে মুখ ধুতে।
কি রঙ উঠেছে কলিতে—
আমি পারি না আর সহিতে
লুঙ্গি ছেড়ে উল্টা টেড়ি রঙিন চশমা চোখেতে,
কোমর গুজে সিজার লাইট রিস্টওয়াচ হাতেতে।
কি রঙ উঠেছে কলিতে—
আমি পারি না আর সহিতে।
মেয়েছেলে তিনবেলা ভাই মুখ ধুচ্ছে বার্ডসাহিতে।
হাতেতে কংকণ তুলে, স্টিলের মালা গলাতে,
কমরেতে চেন থাকে ভাই ছুরি থাকে থলিতে,
দেশে রীতিনীতি দেখে কানাই ভাবে মনেতে।[১১]
কি রঙ উঠেছে কলিতে—
আমি পারি না আর সহিতে।
রঙিন ফিতায় বাঁধছে মাথা জল দিচ্ছে উপরেতে।
কি রঙ উঠেছে কলিতে।

হাতে ছাপানো বই নিয়ে লোকটি গান করছিল, সুর তাল লয় ঠিক রেখে। গত সন্ধ্যায় ছোট মেয়েরা যে তুষু গান শুনিয়েছে[১২] তা শুনে বললো—'এ ঠিক তুষু গানের সুর নয় বাবু।

১১ এটি তুষু গান। অথচ ভনিতা যুক্ত, যা সাধারণত হয় না।

১২ আগের দিন রাত্রে বাঁকুড়া শহরের বাউরী পাড়া থেকে তুষু গান 'রেকর্ড' করেছিলাম।

আমি যা গাইছি তাই ঠিক সুর'। সুর সচেতন এই গায়ক এবং তার দলবল অনেক দূর থেকে এসেছে, বড় ক্লান্ত। এখন ওরা স্নান করবে। খাবে। তারপর নৃত্য গীত বাদ্যে মাতবে। তবুও একজনের হাতে বাজতে লাগলো—ড়ু গু-উ, ড়ু গু-উ, ড়ু গু-উ, ড গ-অ ড গ-অ ডগ্।

আরে ব্বাস্, এ আবার কি! আকাশে প্রসারিত দুহাতে চারটে আইসক্রীম নিয়ে সচীৎকারে আইসক্রীমওয়ালা গান ধরেছে —তুষু গান—

ছোট বিহা দিলি মা কেনে!
মাগো আমি ফুল পাতাবো ফুলকে আমি কি দিব?
বাজার যাবো পয়সা পাবো ফুলকে ফুলন্ তেল দিব।
ছোট বিহা দিলি মা কেনে!
আমি মরব গরল বিষ খেয়ে।
লদী ধারে লীল্ বুনিল লীলের গুটি ধরে না,
ছোট দেওর ঘরে আছে লীল পাড় বই পরে না।
ছোট বিহা দিলি মা কেনে!

একজন আইসক্রীমওয়ালাও তুষু গাইছে, বিস্ময় সেইখানে। ওর নাম বিজয় বাউরী, গ্রাম পায়রাচাঁদী। বয়স ৫০/৫২ বছর। পরণে খাটো ধূতি, গায়ে ময়লা ফতুয়া। এমন চীৎকার করছে যে মনে হবে এখনি ওর গলার ফুলে-ওঠা একটা শিরা ছিঁড়ে যাবে। গানে চীৎকারে নৃত্যে উল্লাস ফেটে পড়ছে। বেচনদারের কেরামতিসর্বস্ব ভঙ্গি যে নয় তা সহজে বোঝা যাচ্ছে। বড় দরদ আর দুঃখের ভাব ছিল সেই আপ্রাণ পরিশ্রম করে গাওয়া গানে-'ছোট বিহা দিলি মা কেনে!'

দক্ষিণায়নের শীতের সূর্য এখন মধ্যগগনে। প্রায় ২৫/৩০ হাজারের বেশী নারীপুরুষ নেমে এসেছে কংসাবতী গর্ভে। সমুদ্রের

উপরিভাগের ক্ষুব্ধ তরঙ্গের শব্দালোড়ন সমুদ্রগর্ভের মধ্যে আছে কি না ডুবুরিরা বলতে পারবে। সম্ভবতঃ নেই। কিন্তু এই তুষ-সমুদ্রের তরঙ্গক্ষেপ ও অনন্ত গর্জন মেলার গর্ভে নিমজ্জিত হয়েও শোনা যাচ্ছে। মাতাল হয়ে উঠছে আমার মন, চঞ্চল হয়ে উঠছে রূপভুখা দৃষ্টি, আনন্দউন্মুখ হৃদয়। এত রূপ, এত বৈচিত্র্য, এমন অবারণ আনন্দিত মানবস্রোত আমি আর কোথায় দেখেছি! মেলার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছি 'কস্তুরিমৃগসম'। মৃৎপ্রোথিত ছোট বড় মসৃণ পাথরের মাথায় মাথায় পা দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এ-দিকে যাচ্ছি ও-দিকে যাচ্ছি। কোন্‌টা দেখবো, কোন্ দলের গান শুনবো ঠিক নেই। মনের ডিঙায় পাল তুলে দিয়ে দাঁড় কোলে নিয়ে বিহ্বল হয়ে সফেন সমুদ্র দেখার মত আমার অবস্থা।

নদীর এ-পারে পোরকুল, ও-পারে ঘোড়াধরা ও বারগাঁ (রাণীবাঁধ থানা)। বারগাঁর কোল ঘেঁষে নদীর গাবায় তুষু নৃত্যগীতের প্রধান আসর চলমান ও আবর্তিত। কারণ এ-পারে দোকান পাটে জায়গা জোড়া, ও-পারে যাবার বাধা নেই, নদীতে জল নেই। ওপাশেই তাই গায়ক গায়িকাদের চলমান জমায়েত জমজমাট।

দেখলাম একদল কুমারী, বধূ, গিন্নীবান্নী মেয়ে জলের কিনারে জটলা করে তুষু গাইছে। তারই মধ্যে দুটি কালো কালো ভরা যুবতী বধূ হাত ধরাধরি করে মুখোমুখি নাচছে। অন্য দু'তিন জন নিচু পায়ের শাড়ী তুলে তেল ঘসছে। স্নান করবে। এত কলকোলাহলের মধ্যেও তাদের হঠাৎ হঠাৎ হাসির লহরা কানে আসছে। রঙ্গ দেখে আমার মুখেও হাসি ফুটলো। কি গাইছে ওরা? এগিয়ে গেলাম লজ্জা সরিয়ে। ওরা গাইছে—

সীতা বলে দাও ছেড়ে, ও রাম কাঁদে বনে।
সীতা হরে লিল রাবণে, ও রাম কাঁদে বনে।
রামের হাতে সোনার যাঁতি, আজ কি রামের অধিবাস।
চৌকা কাটায় (?) লেখা আছে চৌদ্দ বছর বনবাস।
আর কি রে রাম ডাকবি মা বলে?
ও রাম সাজেছ বনের পথে—
আর কি রে রাম ডাকবি মা বলে?
বনে বনে ঘুরে ঘুরে সীতা হারা হয়েছে,
সীতা আমার নয়নের কাজল।
আমি হয়েছি সীতা হারা, সীতা আমার নয়নের তারা॥

যারা গাইছে তারা অন্যমনা, যারা হাসছে তারা অন্তরঙ্গে হাসছে। গায়িকাদের সমবেত কণ্ঠ করুণ কান্নায় কাঁপছিল। 'আর কি রে রাম ডাকবি মা বলে'—উচ্চারণের সময় প্রীতি ঝরে পড়ছিল সামগ্রিক আবেদনে। আমার ভাষা ওরা বোঝে না, ওদের ভাষা আমি বুঝতে পারছি না। অথচ উভয়েই বাংলা বলছি। মুশকিল আসান করতে এগিয়ে এলো একটি চকিত চোখের মেয়ে, মাথায় সিঁদূর পড়েনি। শুনলাম ওরা এসেছে পুখুরিয়া থেকে। ওরা ত্রিগুণা মালাকার, গৌরী, কবিতা প্রভৃতি। এমনি ইতিউতি মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে হাসতে হাসতে নাম ছড়িয়ে দিচ্ছিল। আবার তারস্বরে গান ধরছিল, গানের কলি ভুলেও যাচ্চিল।

ভাতের হোটেল-সারির রাস্তায় উঠে এসেছি। ভিড় ঠেলে একটি তুষুর দল বীরবিক্রমে এগিয়ে চলেছে। প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন জোয়ান মদ্দ। ধামসা, নাগরা, বাঁশি, মাদল, করতাল, ঢোলক সব একসঙ্গে বাজাচ্ছে। চার পাঁচ জন সমস্বরে চেঁচাচ্ছে অর্থাৎ তুষু গাইছে। কারও কারো হাতে তুষু গানের ছাপানো চটি চটি বই।

আর চলছে ধেই ধেই নৃত্য, বাজনার তালে তালে। বেশ বড় গড়নের তুষু মূর্তি (ময়ুরবাহন) যে মাথায় নিয়েছে সেও নাচছে। ফিন্‌ফিনে রঙীন কাগজের 'চৌদল' তৈরী করে দুদিকে দুজন কাঁধ দিয়ে পালকীর মতো বইছে এবং নাচছে। আর বিচিত্র সব খেলনা নিয়েছে হাতে হাতে। লম্বা লম্বা লাঠি বা বাঁখারির মাথায় পাখি, মানুষ প্রভৃতি পুতুল, তিনটে চারটে সুতো বেঁধে খুঁট হাতে নিয়েছে বাহক, সুতোতে টান দিলেই ওর লাঠির মাথায় পাখি ডানা ঝাপটাচ্ছে, এর লাঠির মাথায় মানুষ হাত পা ছুঁড়ছে। সব মিলিয়ে একটা দারুন মজার ব্যাপার। গান গেয়ে গেয়ে গলা ধরে গেছে অধিকাংশের। এরা আসছে বরাগড় থেকে। নরহরি বাউরী, মদন মোহন বাউরী মূল গায়েনের মতো গাইছে—

মদনমোহন ছেড়ে গেছে দলমাদলে কি আছে
ও তোর জটে বাঁধা কি আছে, চলতে কেমন ক্ষিধা লাগেছে।
বিষ্টুপুরের ডেকরণ শাড়ী পরবার যদি মন ছিল
জোড়তলারি হাটতলাতে বসে বসে দম গেল।
কংসাবতী কে বলে ভালো ?
ওরে অহড়ে বহড়ে গাড়ী চালাও রে গোড়াবাড়ী
গোড়াবাড়ীর পাথর ভেঙে বাঁধাবো কাঁসাই নদী,
তারে তারে আসছে রে পাথর
ওরে তারে তারে আসছে রে পাথর,
তোরা তেইরণ (?) যাবার রাস্তা কর।

এদের দাপট যেমন উচ্চ, গলা যেমন ধরা, গান তেমনি এলোমেলো, গান মুখস্ত নেই। একদল ডাকাতকালো লোক লাফাচ্ছে, চীৎকার করে গান করছে, কাশছে খক্ খক্ করে। তুষু গানের কোন সৌন্দর্যই এরা বিতরণ করতে পারছে না।

ওদিকে সরে গিয়ে আর একদল মেয়ের মুখোমুখি হলাম। সুন্দর সুরেলা কণ্ঠে একটি মেয়ে গাইছে—

লব কুশে ধরেছে ঘোড়া, সীতা বলে দাও ছেড়ে।
তোর মন আমার পাঁজরায় গাঁথা
যেন টেংরা মাছের নাই কাঁটা লো।

রামকাহিনী থেকে নিজকাহিনীতে গান চলে এলো। তুষু গান এমনি করে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যায়। অপূর্ব গ্রাম্য একটি উপমায় সাজানো এই গানটি আমার মনের মাঝখানে অনেকক্ষণ রিন্ রিন্ করে বাজতে লাগলো, ভাসতে লাগলো নাকে পিতলের রিং পরা গায়িকার কালো সুডোল মুখ।

একজনের হাতে আছে খুব বড়, মানুষ সমান লম্বা, তালপাতার পাখা। আর ক'জনের হাতে সুন্দর বাঁধানো লাঠি। প্রবল শক্তিতে পাখা নেড়ে হাওয়া করছে, মাথায় লাঠি তুলে মদমত্ত নৃত্য হচ্ছে জোড় পায়ে। কয়েকজন জোয়ান নাগ্‌রা বাজাতে বাজাতে, সঙ্গে খঞ্জনি ও বাঁশি, বাজাতে বাজাতে তুষু গাইছে। গান চলছে বীরদাপে। তালপাতার পাখা কেন, জিজ্ঞাসা করেও জানা গেল না। নাচতে নাচতে একজন বালির উপরে শুয়ে পড়ছে, আবার লাফিয়ে উঠছে আকাশে।

সানাই ও মাদল নিয়ে আমজোড়া থেকে এসেছে আর একটি দল। তারা গাইছে—'ভাব করে নে দিন ফুরায়ে গেল'। গাইছে রামকমল মাহাতো, জগন্নাথ মাহাতো। সানাই বাজাচ্ছে সহদেব সহিস। মাদল বাজাচ্ছে রাখাল মাহাতো। সানাইয়ের পোঁ পোঁ সহ গান বেশ জমেছে—

ওগো ও ঠাকুরপো বসে কেন?
ভাব করে লে দিন ফুরাই গেল।

জল হেল জলে ফেল জলে তোমার কে আছে,
অন্তরে বুঝিয়া দেখ জলে তোমার শ্বশুর ঘর আছে।

পিঠোপিঠি ছুটি টুসু[১৩] মূর্তি বসে আছে। টুসুর সারা শরীরে এক টাকার ছু'টাকার নোট গাঁথা, নোটের মালা গলায় ঝোলানো। বেশ বড় মূর্তি টুসু ছুটির বাহন কিন্তু ময়ুর নয়, ঘোড়া। বাহন ঘোড়া টুসু মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য সব বড় মূর্তি টুসুর বাহন দেখেছি ময়ুর। একজন বললো, ঘোড়াবাহন টুসু, বর্ধমান জেলার টুসু। অবশ্য নানাজনের হাতে, বিশেষ করে মেয়েদের হাতে 'একানে' টুসু মূর্তিও আছে। রঙ করা সাধারণ মাটির পুতুলের মতো, শাড়ী পরা, দাঁড়ানো মূর্তি, দশ বারো ইঞ্চি, আষ্টে পৃষ্ঠে গাঁদা ফুলের মালা জড়ানো।

গ্রাম বেঠুয়ালা। মেলা থেকে দশ মাইল দূর। সেখান থেকে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে আসছে বীরু শবর, গুরুপদ মাঝি, সত্যনারায়ণ সর্দারের দল। এই দলটির সঙ্গে মেয়ের সাজ পরা চারজন যুবকও আছে। বুড়ো সর্দার বীরু শবর, জাতিতে খেড়িয়া, গানের রসে, মহুয়ার রসে ঢুলুঢুলু। 'ভালবাসা এমনি নেশা ভুলতে পারি না।' গানের সঙ্গে চোখে চোখে ইশারা ছুঁড়ছে নারীবেশী যুবকেরা। বুড়ো সর্দ্দার মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে রসিক সমঝদারের মতো—

ভালোবাসার এমনি নেশা ভুলতে তো আর পারি না,
ভালোবাসা করলে পরে কেন দেহ মন মানে না।
একা ঘরে ঘুম তো ধরে না,
ওগো তুমি আসবো বলে আলে না।
ভালোবাসার এমনি নেশা ভুলতে তো আর পারি না॥

---

১৩ এতক্ষণে জানতে পারলাম এরা 'তুষু' বলছে না 'টুসু' বলছে। দক্ষিণ বাঁকুড়ায় পুরুলিয়ার মতো 'টুসু' বলে, শহর বাঁকুড়ায় বলে 'তুষু'।

এখানে এসেও যে 'বব্বি' ছায়াচিত্রের নায়ক নায়িকামূর্তি দেখতে পাবো ভাবতে পারিনি। প্যান্ট সার্ট পরা পুরুষ, পাশে আধুনিকা নারীমূর্তি, এ পিঠে এক জোড়া ও পিঠে এক জোড়া। মাজাকাটা গ্রাম থেকে এরা এসেছে নতুনত্ব নিয়ে। মাঝি আর মাহাতো-বংশের জোয়ান এরা। একটু নম্র, বিনীত। উদ্দাম নয় এদের গান। এরা গাইছে—

গোলের মাঝে দেখা হলে বলতে নারে ততক্ষণ,
তোমায় ছাড়া রইতে নারি ঘরেতে থাকে না মন।
দেখা দিবি তুই আমায় কখন ?
পিরিত করবো গো মনের মতন।
ঘরেতে থাকিলে ধনি মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণ।
কি করিব কোথা যাবো তোমা ছাড়া মনে লাগে না মন।
দেখা দিবি তুই আমায় কখন।
ও পিরিত করবো গো মনের মতন।
মনের কথা বলবো বলি বাইরেতে পাবো যখন॥

কোন যুবাপুরুষের দল ঝিমিয়ে পড়েছে। থেমে গেছে গান। ক্লান্তি দূর করে নিচ্ছে একটু দাঁড়িয়ে রসমস্‌করা করে। পাশ দিয়ে চলে গেল কিশোরী যুবতীদের দল। তাদের গানের সুরে অল্প ঢেউয়ের কলকল। তারা হয়তো বাঁকা ইশারায় ছড়িয়ে দিল সে কলকাকলি। তাই দেখে ও শুনে ক্লান্ত যুবকদের দলে উল্লাস জাগলো। ক্লান্তি ছুঁড়ে ফেলে তারা পুনরায় গান ধরলো চিল চীৎকারে। এমন দৃশ্য এখানে ওখানে চোখ পাতলেই দেখা যাচ্ছে।

সমগ্র মেলার দৃশ্য এক জায়গায় বসে দেখছি। একটা বড় পাথরের উপর অনেকেই বসে আছে, দেখছে, উপভোগ করছে। আমিও বসে আছি। সমস্ত মেলা লাল আর সাদা রঙের বাহারে

জ্বল জ্বল করছে। লাল শাড়ী মেয়েদের, সাদা জামা ধুতি ছেলেদের। কিছু নীল রঙেরও মিশেল আছে। মাথার উপরে মধ্য শীতের সূর্য। সোয়েটারের তলায় গেঞ্জিও ঘামে ভিজছে। অসহনীয় গরম। শুনতে পাচ্ছি সহস্র সহস্র মাদলের এলোমেলো ধ্বনি। সমস্ত মেলাক্ষেত্র মাদলের শব্দবন্যায় ভেসে যাচ্ছে। এমন বিপুল বিচিত্র শব্দতরঙ্গ ধরে রাখবার শক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়ের নেই। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমগ্র মেলাদৃশ্য একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে, সমতল ভূমিতে মেলা বসলে এমন করে দেখা যেত না মেলার সামগ্রিক ছবিটা। উপর থেকে নদী জলরেখার কাছ পর্যন্ত থরে থরে মানুষের, আনন্দিত মানুষের, সংগীতরত নৃত্যপর মানুষের দল নড়ছে চলছে ঘুরছে উল্লাসে ফেটে পড়ছে।

চিলেগাড়া গ্রাম থেকে একদল মেয়ে এসেছে। তারা গাইছে—

ওরে তুই না কি রে বি. এ. পাশ করা,
তুইও হলি বউয়ের বশ করা!
যে না চলে আমার কথায় তার সঙ্গে মন চটেছে
বড় ঘরের কাঠির বাক্স সেই দেখে মন ভুলেছে।
ওরে তুই নাকি রে বি এ পাশ করা!

সুরেলা গলায় ব্যঙ্গ ঝরে পড়ছে। ব্যঙ্গের ধারে তীক্ষ্ণ এই মেয়েদের কি সব নাম—কিন্‌কি, মুসুরবুড়ী, ছুটু, কোম্পানী, জানুকী ইত্যাদি। মেয়েদের হাতে আছে টুসুর মূর্তি, মাটির পুতুল। সাধারণ নারীবেশ ১০/১২ ইঞ্চি লম্বা মাটির পুতুল। গ্যাঁদা ফুলের মালা জড়ানো। গান গাইতে গাইতে জলে নেমে ঝুপ ঝুপ করে ছুঁড়ে দিচ্ছে মূর্তিগুলি।

আর একটি দল জমকালো টুসু মূর্তি এনেছে। চারদিকে পাঁচটি ময়ূরবাহন টুসু মূর্তি জোড় দিয়ে একটি মাচান তৈরী হয়েছে। ওপাশে 'বীরখাম উপজাতি উন্নয়ন সমিতি' থেকে টুসু ভাসাতে

এসেছে চৌদলে করে। এরা গান গাইছে না, আনন্দে নাচছে। টোকা মাথায় লাঠি হাতে নাচের খেলা খেলছে।

এমনি করে যেকটি দলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, তা ছাড়াও রয়ে গেল হাজার হাজার দল। কত না অশ্রুত গান রয়ে গেল অগোচরে। মনের মধ্যে আকুলি বিকুলি করে লাভ কি তাই দাঁড়িয়ে আছি একটি উঁচু পাথরের আড়ালে, ছায়ায় রাকডাঙা গ্রামের নিরঞ্জন মাহাতো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলে তার সঙ্গে আলাপ হল। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বই সে পড়েছে। সে বললো, আজকাল টুসু গানের বিষয়েই শুধু নয়, সুরেও বৈচিত্র্য আসছে। রবীন্দ্রসংগীত, অতুল-প্রসাদী, শ্যামাসংগীত, সংকীর্তন প্রভৃতির সুরে টুসু গাওয়া হচ্ছে কিছুদিন আগে বাঁকুড়া শহরে 'একবিংশতিতম হস্তশিল্প প্রদর্শনীতে টুসু গান ঐ ভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, মাচানতলায় বঙ্গবিদ্যালয়ের মাঠে।[১৪] নিরঞ্জন মাহাতোরই বক্তব্য, টুসু গান গাইছে এমন সাওতাল এখানে নেই, এ মেলা সাঁওতালদের মেলা নয়, যদিও সাঁওতালরা এসে থাকে, তারা এসেছে মেলা দেখতে বা উপভোগ করতে। যেমন এসেছে মুসলমানেরাও! এ মেলা হিন্দুদের মেলা টুসু মূর্তি ও গান নিয়ে এসেছে উচ্চবর্ণ ও প্রধানতঃ নিম্নবর্ণের হিন্দু।[১৫]

এই মেলায় সাঁওতালদের উপস্থিতিও যে ঘনিষ্ঠ ভাবে ঘটেছে তার প্রমাণ উপরের 'অনুসন্ধান অফিসের' মাইকে শোনা যাচ্ছে

---

১৪ এই প্রদর্শনী আমি দেখেছিলাম কিন্তু রাত্রে গানের আসরে থাকতে পারিনি। টুসু গানের এ আসর আমাদের উল্লিখিত সাংবাদিক সম্মেলনে পরিবেশিত টুসু গানের আসর বসার আগে বসেছিল।

১৫ আলোচ্য নিবন্ধে উল্লিখিত নামগুলির উপাধি বিচার করে দেখলে তা বোঝা যায়।

সাঁওতালী ভাষায় ঘোষণা, হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের খবর। বাংলাভাষা ও সাঁওতালী ভাষায় ঘোষণা চলছে। আর দেখলাম একটি ছেলে তার কাপড়ের ঝুলি থেকে মেলায় ছড়িয়ে দিচ্ছে ছাপানো কাগজ কার্ড। সাঁওতালী ভাষায় মুদ্রিত যীশুবাণী। অথবা বাইবেল সমাচার। অদূরেই সারেঙ্গা, বাঁকুড়া জেলার সর্বপ্রধান খৃষ্ট অধ্যুষিত অঞ্চল। কুড়িয়ে নিয়ে দেখলাম কাগজে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ধৃতি আছে—

১ হড় হপণকো লাগিৎ—যীশুগি !
যীশু লাগিৎ—হড় হপণকোগি ![১৬]

২ তেহেঞ গাপা যীশু দ
আবে লাগিৎ চেৎ এ চিকাআবোনা ?[১৭]

৩ বীডাওলেনায়, মেনখান
ভাগেয়াঃতে বাড়ীঃ আঃ ভাগাওকেদায়।[১৮]

এই ধরণের নানা উক্তি লেখা আছে কাগজগুলিতে। যীশু এইভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছেন বঙ্গবাসীদের অন্তরে। ঐ মাইকের ঘোষণা এবং এই সাঁওতালী ভাষায় মুদ্রিত যীশুবাণী প্রমাণ করে যে এই মেলায় সাঁওতালদের উপস্থিতি নিতান্ত কম নয়।

আগে থেকে যখন খোঁজ খবর নিয়েছি, এই মেলা সম্বন্ধে নানা দুর্নাম শুনেছিলাম। এখানে সহুরে মানুষদের ঢুকতে দেয় না। এ মেলা সাঁওতাল যুবকযুবতীদের মেলা। দারুণ বেলেল্লাপনা হয় ইত্যাদি। তাই যাবার সময় ভয়ে আমার টেপরেকর্ডার সোয়েটারের নিচে লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঐ দুর্নাম

১৬ যীশু সমুদয় মানবের জন্য এবং সমুদয় মানব যীশুরই জন্য।

১৭ বর্তমানে যীশু আমাদের জন্য কি করিবেন ?

১৮ পরীক্ষিত হয়েছিলেন কিন্তু উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজিত করেছিলেন।

সামান্ত অংশেও সত্য নয়। কোন বেলেল্লাপনা সেখানে দেখিনি। মদ বা হাঁড়িয়া কোথাও বিক্রী হতে দেখিনি। নারী বা পুরুষের মধ্যে সম্ভ্রমগত ব্যবধান সর্বত্র, সব সময় ছিল। পুরুষদের যখন নারীর প্রয়োজন হয়েছে তখন তারা যুবককে নারী সাজিয়ে এনেছে রঙ্গে মেতেছে, সরাসারি একদলে নারীপুরুষের মাতামাতি দেখিনি আর এ মেলা যে সাঁওতালদের নয় তা আগেই বলেছি।

পুরুষকে নারী সাজিয়ে আনন্দে মাতামাতি করার একটি দৃশ্য দেখতে পেলাম মেলা ছেড়ে চলে আসার সময়। মেলা পরিধির একদিকে ধানের মাঠে 'বুলবুলি' নাচের আসর জমেছে। রা অঞ্চলের ছো নৃত্য যেমন বিশিষ্ট তেমনি 'বুলবুলি' নাচও বৈশিষ্ট বহন করে। চারজন কৃষ্ণ ও চারজন রাধা মুখোমুখী এগিয়ে পিছিয়ে নাচে গানে মনের কথা বলছে, ডগ-অ ডগ-অ করে নাকড় বাজছে, লাঠি মাথার উপর ধরে একজন লাফাচ্ছে। ঐ চারজন রাধা নারীবেশী যুবক, সত্যিকার নারী নয়। এরা এসেছে গড়গড়িয়া গ্রাম থেকে। মাধব মাহাতোর দল। এখনো কোন বিশেষ কাহিনী নির্ভর পালা আরম্ভ হয়নি। সরস্বতী বন্দনা চলছে—

এসো মাগো সরস্বতী
কণ্ঠে দাও মা ভর গো,
তোমারি চরণে মাগো
করি নমস্কার গো।

গ্রামে গঞ্জে মফঃস্বল শহরে তুষু পূজা ও উৎসবের খোঁজ নিে দেখেছি যে এই পূজা ও উৎসব সাধারণতঃ কুমারী মেয়েদের বালিকাদের। বাঁকুড়া শহরে, হুগলী জেলার তারকেশ্বর অঞ্চলে এই ধারণাই সত্য। কিন্তু পোরকুল দেখালো যে এ উৎসব

সমভাবে নারী ও পুরুষের উৎসব।[১৯] এই মেলায় যদি ৪০ ভাগ মেয়ে আসে তো ৬০ ভাগ ছেলে উপস্থিত হয়েছে। আর গান বিশুদ্ধ ভাবে গাওয়াই এদের উদ্দেশ্য নয়, গানের সূত্রে নৃত্য করা[২০] আর প্রাণে যত আনন্দ আছে তাকে প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। মেয়ে দলের কারও হাতে ছাপানো তুষু পুস্তিকা দেখিনি, ছেলেদের অনেকের হাতেই যা দেখেছি, দেখেছি হাতে লেখা গানের খাতা। বই বা খাতা দেখে যে তারা গাইছে তাও নয়, তারা যে পড়তে জানে এরকম একটা ভাব ফোটানোর জন্মেই যেন হাতে হাতে গানের বই বা খাতা।

বিকাল তিনটা থেকে মেলার গতিস্রোত উল্টোমুখে বইতে লাগলো। লাল ধুলো উড়িয়ে অনেকেই ঘরে ফিরছে। আমরাও ফিরলাম। মনে মনে সেই ভরপুর আনন্দ উচ্চারণ করলো রবীন্দ্র-গীতবাণী-'এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়/ ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়'। না, অন্য সব কিছুই হয়েছে এই একদিনের মেলায় কিন্তু বিদায় নিই নি, নিচ্ছি না। আর তুষু বিসর্জনের বেদনা হয়তো ছিল, কিন্তু তার সহস্রগুণ বেশী ছিল আনন্দ। যাঁরা কলকাতা থেকে তুষু সংগ্রহ করেন, তাঁরা শুকনো মরা তুষু পান, আট্‌লাণটিককে না দেখে আট্‌লাণটিকের নুড়ি সঞ্চয় করার মতো ব্যর্থ তাঁদের তুষুপ্রেম।

আমি আজ যে তুষু সমুদ্রে গাহন করলাম, ঘট ভরলাম—মন ভরলাম! আমাকে আবার আসতে হবে এখানে—মকরমেলায় তুষু মেলায়, আসতে হবে বারবার[২১]।

মন ভরেছে তবু দেহ বড় ক্লান্ত। রুক্ষ মাঠ, কিছু সরষে ফুল মাঝে মধ্যে, কোথাও ঘন সবুজ গম ক্ষেত। চারিদিকে দূরে দূরে ছোট ছোট পাহাড়ের রেঞ্জ। মেলার শব্দসমুদ্র পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি। তখন আমাদের চলমান শরীরের ছায়া সামনের পথের বুকে পড়ছে। চলতে চলতে আর একবার ফিরে দাঁড়ালাম মেলার দিকে। কেন জানি না, দুচোখ ভরে জল এলো। এ অশ্রু কিসের, বিদায়ের বেদনার, না ভরপুর আনন্দের? কে জানে॥

৪· তুষু না টুসু

কথাটা 'তুষু' না 'টুসু' এই নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। ডঃ সুধীর করণ[২২] ব্যবহার করেছেন টুসু শব্দটি। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল সিংহ[২৩] ব্যবহার করেছেন তুষু শব্দ। ভারত-কোষ[২৪] এ আছে 'টুসু'। আমাদের অভিজ্ঞতায় ও গান সংগ্রহের নজির অনুযায়ী দুটি শব্দই প্রযোজ্য। তবে 'তুষু' শব্দটিই, সব দিক বিচার করলে, সর্বাধিক গ্রাহ্য বলে মনে হবে। কারণ তুঁষ বা ধানের 'তুষ' থেকেই তুষু শব্দটি এসেছে। তুষু নিঃসন্দেহে শস্য-দেবী। 'টুসু' শব্দটির মধ্যে 'তুষ' এর উপস্থিতি নেই বললেই হয়। যদিও দক্ষিণ বাঁকুড়ায় এবং পুরুলিয়ায় 'টুসু' শব্দটিই প্রচলিত। 'টুসু' শব্দটি একেবারে প্রত্যন্ত সীমার, ভৌগোলিক ও ভাষাতাত্ত্বিক উভয় দিক থেকেই প্রত্যন্ত সীমার শব্দ। তুষু থেকে টুসুর মাঝখানে আরো অনেক নাম বা শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায় গানে বা ছড়ায়। যেমন তুষ্‌লা, তোষ্‌লা, তুষল, তুসল, তুসু, তুষুলী, তুষ্‌লী, তুষতুষলী তস্‌তোস্‌লা, তোস্‌লা তুষ্‌তুষালি, তুষুলা, তিষু প্রভৃতি। এই সবকটি শব্দই আলোচ্য প্রবন্ধের 'পরিশিষ্ট' ভাগে সংকলিত গানে এবং প্রবন্ধে ব্যবহৃত ছড়ার মধ্যে উচ্চারিত হয়েছে দেখা যায়। আমরা স্থান বিশেষে তুষু, টুসু ও তোষলা (তষলা) শব্দ তিনটি ব্যবহারে

পক্ষপাতি। কোন একটি শব্দকে বেছে নিতে পারলে আমরা 'তুষু
শব্দটিকেই বেছে নিতাম। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রত
পুস্তিকায় 'তোষলা' ও 'তুঁষতুষলি' শব্দ দুটিই ব্যবহার করেছেন।[২]
স্বামী নির্ম্মলানন্দ ব্যবহার করেছেন-'তুষু' ও 'তুষতুষলী' শব্দ দুটি।[২]

সেকালে তুষু শব্দটির প্রচলনই বেশী ছিল, একালে 'টুসু'ই বেশি
ব্যবহৃত হচ্ছে, হয়তো কালের নিয়মে।

৫· টুসু গানে রামকাহিনী

'সীতা হরণ করলি রাবণ রাখবি সীতাক্ যতনে'—নম্র নারী কণ্ঠে এই রকম একটি গানের কলি শুনলে চমকে উঠতে হয় বইকি। সমস্ত বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার জনমানস টুসু গানে গানে মুক্তি পায়। রামকাহিনী টুসু গানে বারবার এসেছে। সীতা হরণের পরিপ্রেক্ষিতে রাবণের প্রতি ঐ উক্তি আমরা টুসু গানে পেয়েছি। রাবণের প্রতি যেন কিছুমাত্র বিদ্বেষ নেই ঐ উক্তিতে। নানা দিক থেকে বিচার করে মনে হয়েছে রামকাহিনী টুসুগানে প্রক্ষিপ্ত ব্যাপার নয়। সামাজিক নানা বিষয়, রাধাকৃষ্ণ কথা প্রভৃতি যেমন টুসু গানের বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে তেমনি রামকাহিনী টুসু গানে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য যোগ করেছে।[২৭]

টুসু গানের রামচন্দ্র অবতার নন। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ যে ভাবে রাম পূজায় আন্তরিক অভ্যস্ত, বাঁকুড়াবাসীও কি সে রকম অভ্যস্ত নন? রামকাহিনীর প্রচলন বাঁকুড়ায় কেন এত বেশী? কেন টুসু গানে মহাভারতের কাহিনী বা কাহিনী-অংশ বা চরিত্রনাম

২৭ বাঁকুড়ার লোকসাহিত্যে রামায়ণের প্রভাব একটি স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। অযোধ্যা (বিষ্ণুপুরের অদূরে) নামক প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রামে মনসাপূজা ও দশহরা উৎসব শুরু হয় 'গিন্নী পালন' নামক শুধু গিন্নীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি একদিনের আচার পালনের মাধ্যমে। নির্জন নদীপুলিনে গিয়ে তারা মেয়েদের মধ্যে রাম সীতা সাজিয়ে বিবাহ দেয়, বাসর হয়, নানা রসের রঙ্গের গান চলে। ঐ দশহরা উপলক্ষে মনসা-মঙ্গল গানের আসরে 'দেবতা বন্দনা'য় শুনেছি দশানন রাবণকে দেবতা রূপে বন্দনা করা হচ্ছে। গোপাল ও গৌর পণ্ডিত গাইছিলেন মনসা মঙ্গল।

ভুলেও উচ্চারিত হয়নি? এই সব প্রশ্ন না তুলে পারা যায় না। তুষু গানে সামাজিক বিষয় অজস্র, ব্যক্তিগত রসরসিকতার ধারা অবারিত। কিন্তু তারই মধ্যে কৃষ্ণকথার স্বতোৎসার, রামকাহিনীর সহজ বিস্তার। রাধাকৃষ্ণ লীলার গানগুলিতে কথায় কথায় কথা বেড়ে গেছে। নারীর কণ্ঠে রাধার বিরহ, দেহমিলন, তৃপ্তি অতৃপ্তি, পুরুষ-সেবা প্রভৃতি বিষয়ে সহজ বা গভীর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। রাধা এখানে অত্যন্ত পরিচিত পৃথিবীর মানুষ, অলৌকিক বৃন্দাবনবাসিনী সুদূরপরিচিতা নন। কিন্তু রামকাহিনী, গানের ভাষায় বলতে গিয়ে তুষু পূজারীরা বিপর্যয় ঘটিয়েছেন সবচেয়ে বেশী। এই সব মৌখিক গানে কাহিনীর সূত্র বড় এলোমেলো। বাল্মীকি রামায়ণ অথবা কৃত্তিবাসী রামায়ণের কাহিনী ধারা অবিকৃত ভাবে প্রায় কোন গানেই অনুসৃত হয়নি। রাম সীতাকে বিয়ে করলেন, সেই স্মরণীয় ঘটনা বর্ণনার আগেই দেখি সীতা অপহৃত হয়ে অশোকবনে আবদ্ধ। বাউরী, ভূমিজ, মাহাতো প্রভৃতি তপসিলী নিম্ন-হিন্দু সমাজে এই ধরণের গান সর্বাধিক প্রচলিত। একটি গানে পাই—

এস এস রামকুমারা টুসু গ্যাছে কন্ বনে,
টুসুর পায়ে সোনার নূপুর বাজছেরে অশোক বনে।
অশোক বনের পাতের ক্যাড়ায় সীতা পাশা খেলেছে,
যোগীর বেশে রাবণ এসে সীতা হরণ করেছে।
সীতা হরণ করলে রাবণ সীতা রাখবে যতনে,
মিনি সুতার মালা গেঁথে দুব সীতার চরণে।

সীতার পাশা খেলার প্রবৃত্তি অন্য গানেও পাওয়া যায়। তুষু আর সীতা যেন গানটির প্রথমাংশে মিলেমিশে এক হয়ে যেতে চেয়েছে। পরবর্তী অংশে সীতার স্বতন্ত্র রূপ ধরা দিয়েছে, কিন্তু কাহিনীসূত্র নেই, মিনি সুতার মালার মতোই কাহিনীকে যথেচ্ছ গাঁথা হয়েছে। অন্যত্র পাই—

একটি গণ্ডী ছুটি গণ্ডী তিনটি গণ্ডী পেরিয়ে,
অশোকবনে পাতালপুরী ভিক্ষা দাও মা জননী।
লক্ষ্মণ গেছে গোচারণে আমি ভিক্ষার কি জানি।
একটা গণ্ডী ছুটি গণ্ডী—সীতা চুরি করেছে।
সীতা গেলে সীতা পাবো ভাই নয়নার ঘরে যাবো।
এগ্‌ণার[২৮] মাঝে তুলসী গাছটি, তুলসী ঝুরঝুর করে গো।
এগণার মাঝে সোনার মিগ যায় চলে,
উঠ উঠ লক্ষ্মণ দেওর সোনার মিগ দাও ধরে॥

একটি নাটকীয় মুহূর্তকে ধরা হয়েছে গানটির মধ্যে। সীতা ও লক্ষ্মণ উপস্থিত আছে, রাবণও উপস্থিত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না, যদিও তার নাম উচ্চারণ করা হয়নি। সংলাপের টুকরা গেঁথে গানটি তৈরী হয়েছে। কিন্তু এই মৃগলোভী সীতার অবস্থান কোন অজানা অরণ্যে নয়, আমাদেরই গৃহাঙ্গনে, যেখানে তুলসী গাছটির পাতা মৃদু বাতাসে ঝুরঝুর করে পড়ে বা নড়ে।

তুষু গানের মধ্যে সীতাহরণ, বনবাস, অশোকবনের বন্দিনীর কথাই বেশী এসেছে। কিন্তু নীচের গানটির গতি আরও প্রসারিত-

ও রামের মা, ও রামের মা, রাম কেন ধুলায় পড়ে ?
ছোট ভাজের এমনি মায়া ধুলা ঝেড়ে লেই কোলে।
রামের পায়ে সোনার নূপুর বাজে লো আশোক বনে।
অশোক বনের পাতর কুড়ায় সীতা পাশা খেলেছে,
যোগীর বেশে রাবণ এসে সীতা হরণ করেছে।
সীতা হরণ করলি রাবণ রাখবি সীতাক্ যতনে।
দেখবো রে তোর সোনার লংকা ছুবরে ডাহন[২৯] করে।

২৮ উঠোন, অঙ্গন
২৯ দাহন।

রাম ছেড়েছেন যজ্ঞের ঘোড়া সে ঘোড়াকে কে ধরে ?
লবকুশে ধরেছে ঘোড়া চাবুক মেরে বশ করে।

কাহিনীর বিষয়বিন্যাসে কোন ঠিক ঠিকানা আছে কি ? একি শুধু অজ্ঞতাবশতঃ, না অন্য কিছু। যারা এই সব গান গায় তারা সবাই অশিক্ষিত নয়, যারা রচনা করে তাদের মধ্যেও পুরাণের পড়াশোনা বেশ ভালো ভাবে থাকে। তাহলে এমন এলোমেলো কাহিনী এতদিন ধরে টিকে রইলো কি করে ? অথচ দেখতে পাওয়া যায়, রামায়ণের মূল ঘটনাগুলি এখানে অনুসৃত হয়েছে। এর পরের গানটিতে সবই ঠিক ঠিক বলা হল, কিন্তু শেষ চরণ দুটি এসে গেল কেন ?

ফুল চিরুণী আরশি হাতে বোস মা লাল চৌকিতে,
মাথাও দাও মা সীতা, লক্ষ্মী, তোমারই রাম এসেছে।
রাম এসেছে তপস্যাতে, আজকে রামের অধিবাস।
রাম যদি রে যাবি বনে গাছের বাকল পরে,
সীতা যাচ্ছেন কাঁদতে কাঁদতে লক্ষ্মণ যায় ছাতা ধরে।
লক্ষ্মণ পড়লেন শক্তিশেলে রামের চোখে বয় ধারা।
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, প্রাণ লক্ষ্মণ, প্রাণ নদীর সাহারা।
অ প্রাণনাথ, আমার কিরা[৩০] ওই হরিণটি দাও ধরে,
ধরিতে না পারি হরিণ, তোমায় মেরে দেবো গো।

ঘরের লক্ষ্মী, ঘরের বধূ সীতাকে কত আপন করেই না দেখা গেল! কী মমতাময় সম্বোধন, তোমারই রাম এসেছে, তাই মা লক্ষ্মী সীতা, তুমি লাল চৌকিতে বসে, আরশি চিরুণী নিয়ে মাথা বাঁধো, খোঁপায় ফুল পর।

পঞ্চমাস গর্ভ সীতা রাম পাঠালেন তপোবন।
রাম লক্ষ্মণ রেখে এলো যেখানে অরুণ্য বন।

---

৩০ দিব্যি দেওয়া।

অরুণ্যার বনে সীতা একা পাশা খেলেছে।
যোগীর বেশে রাবণ এসে সীতা হরণ করেছে।
সীতা হরণ করলি রাবণ, পুষ্প রথে ছড়েছে।
পুষ্প রথে চড়ে সীতা, ভাবেন গো মনে মনে,
ছিলাম আমি রাজনন্দিনী এলম গো অশোকবনে।
অশোকবনে পাতার কুড়্যা, কে শুনাল রামের নাম?
নাম শুনে ভাই প্রাণ জুড়াল, কে বট ভাই ভগবান।
ভগবান তো নই গো আমি—আমি বটি হনুমান।
যার লেগে করেছ রোদন তারি আমি অন্বাসন[৩১]।
অযোধ্যা নগরে একটা উঠে গেছে কলরব।
রাম রাজা হবেন বলে বাদ্য বাজে যত সব।
রাম বসেছেন সিংহাসনে, বনে বসেন জানকী,
লক্ষ্মণে ধরেছে ছাতা আর আমাদের বাকি কি?

বেদনরসে ভরা এই দীর্ঘ গানটিতেও কাহিনী সুগ্রথিত নয়। আনন্দের চমক তবু স্থানে স্থানে জেগেছে। এ গান রমনীদের, রমনীমানসের নিভৃতকোণের সঞ্চিত দুঃখ ভাষা পেয়েছে সীতা-বঞ্চনার ঘটনা স্মরণে।

মনের কথা বলতে গেলে যেমন তুষুর কথা আপনি আসে তেমনি তুষুর কথা বলতে গিয়ে রামসীতার কথা এইভাবে এসেছে। তুষু গানের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তুষুর অন্তর্গত এই রামকাহিনী-নির্ভর গানগুলিরও সেই একই বৈশিষ্ট্য। এককালে হিন্দু সমাজে উচ্চ বর্ণেও কন্যাপণ দিতে হত, এ কালে নিম্নবর্ণে যার চল্ আজও আছে। কন্যাপণ আর কন্যাবিক্রী একই ব্যাপার। সীতার পক্ষ নিয়ে তাই তুষু পূজারিনী গাইছেন—

জয়ক সীতা মুষ্টি ভিক্ষা জয়ক সীতা নন্দিনী।

---

৩১ অন্বেষণ, অন্বেষণকারী।

পুষ্প রথে চাপেন সীতা ভাবেন গো মনে মনে।
কার জন্যে বাপ বিচন সীতা আমি আনব রামের নাম।
রামকে চাঁদর, রামকে বাঁদর, রামকে দাও মা বনবাস।
রামের কুষ্টিই লিখা আছে, চৌদ্দ বছর বনবাস।
রাম যদি ভাই যাবি বনে ফিরে দাঁড়াই এগনাতে।
যতগুলি মনের কথা বলে যাও সাক্ষাতে॥

আবার রামের বনবাসে যাওয়ার দুঃখে বাঙালী দুঃখী মায়ের মন আকুল হয়। আকুল হয় সীতাহারা রামের দুঃখে। পোরকুলের মকরমেলায় শোনা মেয়েদের করুণ কণ্ঠের গান ভোলা যায় না। তাদের দেহাতি কণ্ঠে অকৃত্রিম বেদনা কাঁপছিল সেদিন শীতার্ত দুপুরের রোদে। শত শত মাদল ধামসার উচ্চ কলরবের মধ্যেও সেই প্রাণঢালা কারুণ্য বিদ্ধ করছিল শ্রোতার মন—

সীতা বলে দাও ছেড়ে, ও রাম কাঁদে বনে।
সীতা হরে লিল রাবণে, ও রাম কাঁদে বনে।
রামের হাতে সোনার যাঁতি, আজ কি রামের অধিবাস।
চৌকা কাটায় (?) লেখা আছে চৌদ্দ বছর বনবাস।
আর কিরে রাম ডাকবি মা বলে ?
ও রাম সাজেছ বনের পথে—
আর কিরে রাম ডাকবি মা বলে ?
বনে বনে ঘুরে ঘুরে সীতাহারা হয়েছে,
সীতা আমার নয়নের কাজল।
আমি হয়েছি সীতাহারা,
সীতা আমার নয়নের তারা॥

রামকে কত আপন ভাবলে এমন আবেগে আগ্রহে বলা যায়—'আর কি রে রাম ডাকবি মা বলে ?' রাঢ় বাংলার প্রতিটি নারীর মধ্যে এমনি করে বেঁচে আছে চিরন্তন কৌশল্যা।

একথায় সে কথায়, অন্য কথাতেও রামের কথা এসে যায়। আর রামকে তখন দেখতে পাই অদ্ভুত বেশে। যখন রাম বনবাসে যাচ্ছেন—তখন 'রাম যাচ্ছেন লাল টুপি পরে, সঙ্গে দুটি লোক দুব'। এই গ্রামীন নারীর মন রামের বিবাহের বর্ণনা দিতে পারে মাত্র দুটি চরণে—'রামের বিয়া জনকপুরে জনক রাজার কন্যাকে। দানে দিলে ঘটিবাটি তাথে দিল অঙ্গুরী'। যে ঘাটে তুষু স্নান করতে নামবে সেই ঘাটেও রাম লক্ষ্মণের স্মৃতি—'চারকোণা যে পুকুরটি মা লাগমলতায়[৩২] ঘেরেছে, ঐ ঘাটে নামো না তিষু রাম লক্ষ্মণ ডুবেছে।' রাঢ় বাংলার মাতৃমনের সঙ্গে রামের সীতার সম্বন্ধ এমনিভাবে দিনে দিনে গভীর হয়েছে, গভীর গভীরতম হয়েছে বলেই এত সহজে বলা যায়—

বাঁদর ঘুরে চালে চালে বাঁদরের কি পা টলে,
রাম সীতাকে সঙ্গে করে বসে আছি গাছ তলে।

এই সব গানের ভাষার মধ্যে কোন কৃত্রিম কারিগরী নেই, জটিলতা নেই। মরমী আবেগে রামকে অতি আপন করে নেওয়া হয়েছে। সে রাম অবতারবিশ্বাসী ভারতবাসী ও বঙ্গবাসীর দূরের দেবতা নয়, নয় পরমব্রহ্ম পরাৎপর। রবীন্দ্রনাথ কথিত 'নরচন্দ্রমা'ও নয় সে রাম। তুষু গানের রাম ঘরের ছেলে, বনবাসী, সীতাহারা, পরম হতভাগ্য। মা বলে একবার ডাকলে গ্রামীন মায়ের প্রাণ জুড়ায়, এমন রাম তুষু গানের পরিচিত জগতেই বাস করে, আর কোথাও নয়।

দক্ষিণ বাঁকুড়ায় পোরকুলের মেলায়—মকর সংক্রান্তির মেলায় দেখেছিলাম ৫/৬ জায়গায় রামগানের আসর বসেছে, ছোট ছোট

৩২ লবঙ্গলতা।

সাময়িক চালার নিচে। সেখানে নানা রামকাহিনী গানে গানে বলা হচ্ছে। ঐ সব গানের মধ্যে বাল্মীকি রামায়ণ বা কৃত্তিবাসী রামায়ণ কথিত কাহিনীর পারম্পর্য অনেকাংশে অবস্থিত আছে। কিন্তু তারই পাশাপাশি তুষু গানে নেই কেন? যাঁরা কণ্ঠে তুষু গান ধারণ করে নৃত্য-উৎসবে মত্ত হন, যাঁরা বাড়ীর উঠোনে সারা পৌষ মাসের নিত্য সন্ধ্যায় সুর মিলিয়ে সমবেত গান করেন তাঁরা রামকাহিনীর সাধারণ ধারাটিও জানেন না? তা কেমন করে সম্ভব? রামকাহিনী এত পরিচিত, সমগ্র ভারতবাসীর অন্তরের স্মৃতিসম্পদ, তবু ভুল কেন?

মনে হয় মহাকাব্যের আদি রূপ যেন এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পণ্ডিতেরা মহাকাব্যের যুগবিভাগ করেছেন চারটি। লোকমুখে প্রচারিত মহাকাব্যের যুগ, আর্য মহাকাব্যের যুগ, আলংকারিক মহাকাব্য এবং ব্যঙ্গ মহাকাব্য-যুগ। ঋষিকবিদের দ্বারা লিখিত মহাকাব্যই আর্ষ মহাকাব্য। যথা রামায়ণ, মহাভারত। এই ধরণের মহাকাব্য লিখিত হবার আগে লোকজীবনে মহাকাব্যের কাহিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। রামকাহিনীও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তা সংগ্রহ ও সুগ্রথিত করে মহাপ্রতিভাধর বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। তুষু গান ও পূজাপর্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা বলেছেন—এ আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। এর রীতিনিয়ম হয়তো পরিবর্তিত হয়েছে যুগে যুগে দেশে কালে, কিন্তু এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। আবহমান কাল থেকে তুষু গান যদি প্রবাহিত হয়ে আসে তাহলে তার মধ্যে রামায়ণের আদি বিস্রস্ত কাহিনীসূত্র থাকা অসম্ভব নয়।

অথবা লোকমানসের সামগ্রিক পরিচয়ের নিয়মে এমনটি ঘটেছে! রামকাহিনী শোনার পর লোকমানস সেই সেই অংশ-গুলিই মনে রেখেছে যেগুলি মর্মস্পর্শী। সীতার বনবাস, রামের

বনবাস, রামের বিবাহ, অশোকবন, লংকার দাহন, স্বর্ণমৃগ প্রভৃতি প্রধান ঘটনাগুলি তাদের মনে এমনি ভাবে গেঁথে গেছে যে গানে গানে ব্যথাবহনের সময় সেগুলিই চেতন—অবচেতন মন থেকে উঠে আসে সংলগ্নহীন ভাবে। রামসীতার বনবাস-যাত্রা যেমন অক্ষয় স্মৃতিপটে আঁকা, তেমনি আঁকা রয়েছে রামের বিবাহস্মৃতি। কোন এক নারীকে রাম সাজিয়ে, আর এক নারীকে সীতা সাজিয়ে 'দশহরা' উপলক্ষে 'গিন্নীপালন'[৩৩] উৎসব হয় বিষ্ণুপুরের অদূরে দ্বারকেশ্বর নদীতীরের প্রাচীন বর্ধিষ্ণু অযোধ্যা গ্রামে। গিন্নীপালন উৎসব শুধু মেয়েদের নির্জন স্থানে একদিনের উৎসব, সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। অধিবাস,

৩৩ অযোধ্যায় এ বছর গিন্নীপালন উৎসব হয়েছিল ১১ জ্যৈষ্ঠ (১৩৮৩)। পাড়ার গিন্নীরা প্রায় ৮০/৮৫ জন, ব্রাহ্মণ থেকে বাউরী পর্যন্ত নানা বর্ণের বাড়ী থেকে বার হয়ে মনসাথানে জমায়েত হয়। তারপর পাশের দ্বারকেশ্বর নদী পার হয়ে ওপারের 'চটাই'এ আমতলায় জমায়েত হয়ে মানত, মানত পূরণের দান খাওয়া দাওয়া, স্নান, গান, নাটক চলে। সন্ধ্যায় সকলে ঘরে ফেরে। ঐ উপলক্ষে রামসীতার বিবাহের একটি গান, গানটি মেয়েদের রচিত, তাদের দ্বারাই স্বরারোপিত—

জনৈক নারী—সীতা এত সুন্দরী রাম
তুমি কেন কালো হে ?

রামের উক্তি— সীতা সহবাসে আমি
হইব সুন্দর হে।

অন্য নারী— রাস্তা থেকে শুনে এলাম
তুমি বড় ভালো হে,
এখানে এসে দেখি ও রাম
তুমি বড় কালো হে।

রামের উক্তি— সীতা সহবাসে আমি………।

গায়ে হলুদ, বিবাহ, বাসর প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি সারা দিন ধরে চলে—গানে গানে তৈরী হয় আশ্চর্য পরিবেশ। বাঁকুড়ার লোক-মানসে বিশেষ করে নারীসমাজে রামকাহিনী যে এত গভীর ছাপ ফেলেছে তার প্রমাণ এইভাবেও পাওয়া যায়। তুষু পরব পৌষ মাসে, গিন্নীপালন জ্যৈষ্ঠ মাসে, দশহরার চোদ্দ দিন আগে।

তুষু গানের মধ্যে মহাভারতের কাহিনী একেবারেই নেই রাধাকৃষ্ণকথা মহাভারতের কথা নয়। তুষু গানের কৃষ্ণ যেমন মূলতঃ মাধুর্যমূর্তি, তুষু গানের রামও তেমনি মূলতঃ মাধুর্যমূর্তি।

৬ তুষু পরিচিতি

ুষু দেবী নয় মানবী, তুষু মানবী নয় দেবী। এই দুই
িরিচিতির মধ্যেই সত্য যেমন নিহিত আছে, তেমনি আছে
্রান্তি। তুষু কখনই লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা কালীর মতো দেবী
য়। আবার ভাদুর মতো মানবীও নয়। এ কথাও বলা যায়
য তুষু কোন মূর্তিমতী অলৌকিক ভাবশক্তি নয়। তুষু ব্রত
াত্র। মেয়েলী ব্রত। মেয়েলী ব্রতে বেদ বা পুরাণকথিত হিন্দু
দবদেবীর প্রাধান্য নেই। তবু জানি তুষুর মধ্যে বহু বিপরীতের
িলন ঘটেছে এবং ঠিক কোন মূর্তিতে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ধরা
দয় না বলেই তুষুর মধ্যেকার ভাবমূর্তি সম্ভাবনা অসীম।

তুষুর মধ্যে শস্য ও উর্বরাশক্তির আরাধনা। তাই তার
ধ্যে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান সহজসাধ্য। গান বা ছড়ার মধ্যে তুষুকে
লা হয়েছে 'রাই'। 'রাই' অর্থাৎ লক্ষ্মী। আবার তুষতুষলীর
ধ্যে কেউ কেউ লক্ষ্মীর সঙ্গে নারায়ণের উপস্থিতি দেখেছেন।
েউ দেখেছেন বিষ্ণুকে। কেউ এর মধ্যে সূর্য পূজার প্রতীকায়ন
াবিষ্কার করেছেন।[৩৪]

তুষুর 'খোলা'য় নতুন ধানের তুঁষ ও গাইয়ের গোবর-গুলি
িয়ে নিত্য পূজাবিধিই বলে দেয় এটি শস্য উৎপাদন, ধান্য
াচুর্য ও জমির উর্বরতা সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা দিয়ে তৈরী ব্রত।
স্যের সঙ্গে লক্ষ্মী বাঁধা। আবার কেউ বলেছেন— তুষু হচ্ছে
ষিলক্ষ্মীর বাণিজ্যযাত্রা, তাই পৌষ সংক্রান্তিতে ভেলায় তুঁষ ভরে
াসিয়ে দেওয়া হয় নদীতে। তুষুকে লক্ষ্মী ভাবতে আপত্তি
ই, কিন্তু নারায়ণ বা বিষ্ণুর অধিষ্ঠান তুষুর মধ্যে কি ভাবে?

৩৪ তুষু গানের মধ্যে বারে বারে শিবদুর্গার আবির্ভাব ঘটে, বিশেষ
পুষ্পচয়ন বিষয়ক গানে। কেন—সে বিষয়েও চিন্তার অবকাশ আছে।

"তুষ-তুষলী কে ? মনে হয় নারায়ণ ও লক্ষ্মী।...........তু
নারায়ণ তার সমর্থনও এখানে পাচ্ছি। অন্যত্র দেখিতে পা
তুষু শ্রীহরি।" যুক্তি বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না হলে
এই মতের মধ্যে সত্য আছে।[৩৫] আর একটি মতে তুষ
'আলোখলা'র চারপাশের চোদ্দটি প্রদীপ ও মাঝখানের বৃ
দীপাধারটি বিষ্ণুচক্র, অগ্নিদেবতা, চোদ্দতিথি, পূর্ণিমা ও
প্রতীক। এবং তার সঙ্গে আছে পোখর্না (পুষকরণা) অধিপ
চন্দ্রবর্মার স্মৃতি।

"চন্দ্রবর্মা বিষ্ণুর উপাসক। চক্র বিষ্ণুর প্রতীক। কি
দীপশিখা কেন উৎকীর্ণ হইয়াছে? এই বিষ্ণু—পু
পৌষের রবি। এই পুষ্য বা বিষ্ণু চক্রাকার—চক্রাকা
তিনি পরিভ্রমণ করেন। তিনিই পৃথিবীপালক অগ্নি-তা
শিখার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই দেবতার কল্যাণম
বরদাত্রী শক্তি হইলেন লক্ষ্মী বা রাই। কৃষিজাত রবিশ
ধান্য, সরিষা, গুঞ্জা, তিল, রমাকলাই। পৌষ মাসে ক্ষে
সরিষা জন্মে—সরিষার নাম রাই। লক্ষ্মীর অপর ন
রাই। রমাকলাই এই মাসের উৎকৃষ্ট ফসল। পি
পার্বণে রমার পুর অপরিহার্য। কলাই-এর নাম রমা
লক্ষ্মীর একটি নাম রমা। সমস্ত ঘিরিয়া পুষ্য বা বি
পূজা। তাঁহারই শক্তিরূপিণী লক্ষ্মীকে লইয়াই দক্ষি
রাঢের তুষু পার্বণ। তুষুর 'আলোখলা' চন্দ্রবর্মার f
অনুযায়ী গঠিত। বৃত্তাকারে চোদ্দটি দীপশিখা চতুর্দ
তিথির প্রতীক এবং কেন্দ্রের বৃহৎ দীপশিখাটি পূর্ণিম
দ্যোতক।"[৩৬]

শ্রীমানিকলাল সিংহের এই সিদ্ধান্তের পিছনে বাঁকুড়া জেলার শুনিয়া পর্বতগাত্রে খোদিত 'চন্দ্রবর্মার শিলালিপি'টি[৩৭] বিশেষ প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

সাধারণ লোকমানস তুষুর সঙ্গে বিষ্ণু বা নারায়ণের যোগ ঘটাতে পারে, কিন্তু তুষু কোন পুরুষ দেবতা নয়। তুষু পূজায় কোন মূর্তি লাগে না। সরু বা খলা অর্থাৎ মাটির পাত্রে ফুল, গোবর-গুলি, দুর্বাঘাস প্রভৃতি রেখে পূজা হয়। কিন্তু বাঁকুড়া বা পুরুলিয়া জেলায়, বিশেষ করে মানভূম অঞ্চলে তুষু মূর্তি ও চৌদলের প্রচলন আছে। সে মূর্তি সাধারণ রমণীমূর্তি। বেশবাস, বর্ণ, অলংকরণ, দাঁড়ানো বা বসার ভঙ্গী এমন কিছু নয় যার জন্য এই মূর্তিকে কোন পৌরাণিক দেবীমূর্তির সমগোত্রীয় বলা যেতে পারে। অবশ্য এই অঞ্চলে কোথাও কোথাও ময়ুরবাহনা বা অশ্ববাহনা তুষুমূর্তি দেখা যায়, তত্রাচ তুষু কোন বেদ বা পুরাণোক্ত আর্য দেবী নয়। সাধারণ লোকমানস মাতৃমূর্তির প্রভাবেএই ধরণের মূর্তি পরিকল্পনা করেছে। এই ধরণের লোকমানসিকতার প্রভাবে সংস্কৃত মন্ত্রও যেমন রচিত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে। যথা—

গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ নানালংকার শোভিতাং।
সর্বলক্ষণ সম্পন্নাং পীনোন্নতপয়োধরাং॥
দিব্যবস্ত্র পরিধানং শংখপদ্মধরাং শুভাং।
প্রসন্নবদনাং দেবীং ধ্যায়েৎ তুষলাং সর্বসিদ্ধিদাং॥[৩৮]

৩৭ চন্দ্রবর্মা ছিলেন সিংহবর্মার পুত্র। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি দক্ষিণরাঢ়েরও অধিপতি ছিলেন। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পোখর্না (পুষকরণা) ছিল তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী। বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত তুষু গানের মধ্যেও পোখর্নার উল্লেখ আছে।

কোন কোন তুষু গানের মধ্যেও দেবী-আরাধনার আবেগ ফুটে উঠতে দেখা যায়—

তুষুলী এয়োরাণী এয়োতি ভাগ্যমানী
তুমি শক্তি স্বরূপিনী সতী সাধ্বী কল্যাণী
পূজি তোমার চরণ দুখানি।

তুষুর পরিচয় উদ্ঘাটনে আলোচনা দীর্ঘ করা যেতে পারে। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। তুষুর সঙ্গে অন্য যে কোন দেবদেবীর যোগ থাক না কেন, শস্যদেবীর যোগই সর্বাধিক। সেই তুষুকে নিয়ে আমরা যখন আমাদের মনের, আমাদের কামনা বাসনার, জীবনযাপন প্রক্রিয়ার, সাধ আহ্লাদের, ব্যথা বেদনার গান বাঁধি তখন সেই তুষু আর দেবীর দূরত্বে থাকেন না, তিনি তখন হয়ে ওঠেন আমাদের কন্যা বা জননী, সখী বা সঙ্গিণী, আমাদের চারদেওয়ালে ঘেরা সমাজ জীবনের নিন্দা প্রশংসারও অংশভাগী। তাই মল্ল-ভূমের কোন মানুষ যখন তুষুর সম্বন্ধে আলোচনা করেন তখন কোন পণ্ডিতি আলোচনার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি বলতে পারেন—"তুষু কোন দেবদেবী নয়। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ধান কেটে কৃষাণ কৃষাণী খামারে নিয়ে এসে ঝাড়াই করে, তারপর সেই ধান অর্থাৎ মা লক্ষ্মীকে তারা ঘরে তোলে। আবার ধান থেকে চাল তৈরী করে— সেই চাল গোলায় বেঁধে রাখে। চাল করতে গিয়ে ধান থেকে যে তুষ হয়, সেই তুষকে পর্যন্ত গ্রামের মেয়েরা একটি মাটির পাত্রে সুন্দর আলপনা দিয়ে তুষের উপর গাঁদা ফুল সাজিয়ে সমস্ত পৌষ মাস প্রাণের মনের কথা ব্যক্ত করে ছড়া আকারে গান বেঁধে দল বেঁধে সারারাত এক জায়গায় বসে গাইতে আরম্ভ করে।"[৩৯]

এই তুষু যখন বাড়ীর উঠোনে সাজানো থাকে তখন মনে হয় যেন এক সঙ্গে চন্দ্রসূর্য উদিত হয়েছে—

আমাদের উঠানের মাঝে চন্দ্রসূর্য হয় উদয়,
চাঁদের গায়ে তুষুর গায়ে দেখব কেমন মিলন হয়।

তুষুর সঙ্গে সম্বন্ধ কত গভীর, সাধারণ রমণীর মন ভাষা খুঁজে পায় সেই গভীরতা বোঝাতে—

তুস্থ আমার গলার হার, তুস্থ আমার মুখের পান,
তুস্থ আমার আয়না চিরুণী,
তুস্থ বিনে কিছুই না জানি।

এই ভাবেই তুষুর পরিচয়ের মধ্যে কোন দেবদেবীর পরিচয় যতখানি পাওয়া যায় তার থেকে বেশী পাওয়া যায় মানব মানবীর পরিচয়।

৭. তুষু ব্রতের বিধিনিয়ম

তুষু একাধারে ব্রত ও উৎসব। ব্রত একক মানুষের আচরণীয় বিষয় এবং মঙ্গলকামনায়; উৎসব একাধিক মানুষের সম্মিলিত অনুষ্ঠান যার মধ্যে মঙ্গল নয় আনন্দই কাম্য। হুগলী জেলা থেকে আরম্ভ করে বাঁকুড়া-পুরুলিয়া পর্যন্ত অন্বেষণ করলে বুঝতে পারা যাবে, একক ব্রত আচার কেমন করে বহুজনার উৎসবে পরিণত হয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থানের পরিবর্তনে ব্রত ও উৎসবের রীতি নিয়ম কম বেশী পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু তুষুর আন্তরিক মৌল প্রকৃতিটি রয়েছে অবিচলিত।

সর্বত্রই তুষু সারা পৌষ মাস ধরে পূজিত হয়ে আসছে প্রায় প্রতি হিন্দুর ঘরে ঘরে। উচ্চ বর্ণ হিন্দু ও নিম্ন বর্ণ হিন্দুদের প্রধানতঃ কুমারী মেয়েরা এই ব্রত পালনে সর্বাধিক আগ্রহী। আর তারই সঙ্গে দেখা যাবে ছোট ছোট ছেলেরাও তুষু গানে অংশ গ্রহণ করছে নিত্য। বঙ্গদেশের সর্বত্রই মানভূম, মল্লভূম, রাঢ়ভূমেও মকর সংক্রান্তিতে অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তিতে তুষু ভাসানের উৎসব জমে ওঠে। মকর সংক্রান্তির বা তুষু ভাসানের উৎসব নদীর ঘাটে যত-খানি জমে ওঠে অন্য জলাশয়ের ধারে ততখানি নয়। হুগলী জেলায় তুষু উৎসব জমজমাট প্রধানতঃ কুমারী মেয়েদের মধ্যে, কিন্তু বাঁকুড়া পুরুলিয়ায় কুমারী সধবা যুবক প্রৌঢ় বালক বৃদ্ধ সকলেই তুষু পরবে যোগ দান করে আনন্দ উল্লাসকে আকাশস্পর্শী করে তোলে।

প্রথমেই হুগলী জেলার তুষু ব্রতের কথা বলে নিই। অগ্রহায়ণ মাসে এখানে 'ইতু' পূজা হয়। বড় মাটির সরাতে ভালো সার-মাটি দিয়ে তার উপর নানা ডালকলাইয়ের বীজ বপন করে গাছ হয়ে

বাড়তে দেওয়া হয় সারা মাস ধরে। পূজা করে যান বাড়ীর ব্রাহ্মণ পুরোহিত প্রতি রবিবার। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে ভোর-সকালে সেই ইতুর সরা জলে বিসর্জন দেবার পর ঐ সরা ঘরে আনা হয় এবং একটি উচ্চ স্থানে অথবা কুলুঙ্গিতে তুলে রাখা হয়। ঐ খালি সরাতে তুষু (এখানে বলে তষ্‌লা বা তোষ্‌লা) তোলা হয় ঐ দিনই রাত্রে।[৪০] অবশ্য নতুন সরাও পাতা হয় তুষু তোলবার জন্য।

হুগলীর গ্রামাঞ্চলে তুষুর পূজা হয় শেষ রাত্রে। এখানে তুষু পূজার গান শুনিনি, গানের প্রচলনও নেই।[৪১] এখানে প্রচলিত ছড়া। বালিকারা ছড়ার মতো উচ্চারণ করে তুষুর মন্ত্র। পূজা ও কামনার ছড়া, ফুল তোলার ছড়া, স্বাদ দেওয়ার ছড়া প্রভৃতির মধ্যে কতই না বৈচিত্র্য! হুগলী জেলায় ফুল তোলার মন্ত্র—প্রতিটি ফুলকে নিয়ে রচিত প্রায় একই ঢঙে। সরষে, মটর, ঘোল্‌ঘসা, মুলো, বেগুন, কাঁটা নটে, অড়র, মধুফুল প্রভৃতি যত রকম শস্যের ফুল ও আগাছা মেঠো ফুল দিয়ে পূজা হয় তুষুর। অর্থাৎ প্রতি রাত্রে ঐ সব ফুল নিবেদন করে তুষুর সরা ভর্তি করা হয়। তাছাড়া গাঁদা তুষু পূজারিণীদের অত্যন্ত প্রিয় ফুল। তোষলার পাত্র সাজাতে গাঁদার চেয়ে উজ্জ্বল ও টেকসই ফুল আর কি আছে! অবশ্য গোলাপ বা ডালিয়া ফুলের ব্যবহারও দেখেছি। এগুলি ব্যতিক্রম। নানাবিধ শস্যের ফুলেই তুষু পূজার বিধি। বিভিন্ন ফুল তোলার ছড়া এই রকম—

৪০ হুগলী জেলার মেয়েরা বলেন ইতু তোষলা দুই বোন, লক্ষ্মী ঠাকুর। কিন্তু তা নয়। ইতু হচ্ছে মিত্র। মিত্র>মিতু>ইতু। মিত্র অর্থ সূর্য। ইতুর সঙ্গে তুষুর যোগাযোগ লক্ষণীয়, শস্যের সঙ্গে সূর্যের যে যোগ।

৪১ তারকেশ্বর থানার চাঁতুর ও নিকটবর্তী আস্‌তাড়া, মামুদপুর গ্রামে অন্বেষণ করা হয়েছিল।

সরষে ফুলটি থোবা থোবা
তা তুলতে হোল বেলা,
শিব চরণে দেখা হল
শিবের মাথায় জটা।

অন্যের মুখে শুনেছি—

অড়র ফুলটি তুলতে গেলাম
সীতালতার পাতা,
শিবচরণে দেখা হল
শিবের মাথায় জটা।
শিবের একটি কাঁকাল চুল
তাতে কাশমল্লিকের ফুল।

'মটর ফুলটি থোবা থোবা', 'গেঁদা ফুলটি থোবা থোবা', 'মুলো ফুলটি থোবা থোবা'—পর পর এই ভাবে একই রীতির ছড়া বলতে বলতে এক এক ধরণের ফুল দেওয়া হয় তষলা সরায় ভোরে পূজার সময়। পৌষ মাসের বিকালে মাঠে মাঠে ঘুরে ফুল তুলতে যাবার দলবদ্ধ ঝোঁক পড়ে যায় হুগলীর গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায়। ফুল মাঠ থেকে তুলে এনে বাড়ীতে লাউ পাতায় বা কলা পাতায় মুড়ে রাখা হয়।

উঠোনের একটা অংশ নিকিয়ে তষলা সরা নামিয়ে রেখে প্রদীপ জেলে শীতার্ত কণ্ঠে পূজা আরম্ভ হয় নিত্য শেষ রাত্রে। এখানে প্রচলিত তুষু-জাগানোর ছড়াতেও আছে শেষ রাত্রের কথা। প্রথমে জাগরণের ছড়া, যার সঙ্গে পূজারিণীর বাসনাবিকাশের সংযোগও আছে। যথা—

তুষ্-তুষোলো তুষপতি
কেন তুষোলো এতরাতি।
তালবনে হারালাম ছাতি।

সেই ছাতি জাগে
ভায়ের প্রতি লাগে,
ভাই লক্ষ্মণ দুটি ভাই
খলুক খলুক[৪২] পয়সা পাই
সাত সতীনের সাত কৌটো
আমার মায়ের আট কৌটো
আট কৌটো নাড়ি চাড়ি
শ্বশুর শাশুড়ীর কুল বিল্লাত করি।
তষ্‌লা গো রাই, তোমার চরণে যাই।
তষ্‌লা গো রাই, তোমার চরণে যাই।
তষ্‌লা গো রাই, তোমার চরণে যাই।

এই মন্ত্র (ছড়া)[৪৩] বলতে বলতে তিনবার ফুল রাখতে হয় তুষু সরায়। আর বলতে হয়—

গেয়ের গোবর সরষে ফুল
আধ গোবুরের ডেলা,
তোমার পূজো করবো আমি
নিত্যই ভোরবেলা॥

৪২ খেলতে খেলতে।

৪৩ অন্যত্র শুনেছি—'তুষ, /তুষলো তুষপতি/কেন তুষলো এত রাতি।/ কাঁটায় কাঁটায় পড়িল ছাতি। / সেই ছাতি জাগে/ভায়ের প্রতি লাগে।/বাপ রাজা গো, মা রানী- /ফুল লাও গো তষলা রানী।' অথবা—'·········ভায়ের প্রতি লাগে।/ মা বাপের ধন যাচাযাচি,/ স্বামীর ধনে অধিকারী।/ঘর করবো নগরে,/মরবো গিয়ে সাগরে।/ এবার মলে জন্ম নিব উত্তম ব্রাহ্মণের কুলে'। অথবা—'······ খুলুক খুলুক পয়সা পাই।/খুলুকের পয়সা নিয়ে গাঙের বাড়ী যাই।/ গাঙের বাড়ী সরু চাল/এক থামল করে তুলে তুলে খাই।/ আচিরের ধান পাচিরের ধান/সকল ছেলে হাসে,/আমার তষলার বার করেছি নানা ফুলের বাসে।'

পূজা করতে হয় ফুল, তুলসীপাতা এবং যে গোরুর বাছুর মরেনি সেই গোরুর গোবর থেকে ছোট ছোট করে পাকিয়ে শুকনো করা 'গুলি' একটা করে মাটির সরায় দিয়ে। কাঁচা গোবরের সঙ্গে নবান্ন ধানের তুঁষ মিশিয়ে 'গুলি' করতে হয়। সাধারণতঃ তিনবার ফুল, তিনটি তুলসী পাতা আর তিনটি গোবরগুলি দিয়ে পূজা করতে হয়। এরই সঙ্গে কামনা করা হয়—

গেয়ের গোবর সরষে ফুল
ধনে পুত্রে হুল থুল।

অথবা

তুষলার মাথায় দিয়ে ফুল,
ধান হল উলথুল।

পৌষ সংক্রান্তিতে তষলা ভাসানো। তাই আগের দিন বিশেষ আয়োজন। আগের দিন সন্ধ্যায় 'স্বাদ' দিতে হয় তষলাকে। তষলার স্বাদ ভক্ষণের নানা উপচার, নানা আয়োজন, নানা মন্ত্র (ছড়া)—

চাল গোটা তুই রাঁধ গো সখী
ভাত গোটা তুই খাই।
কড়ির চুবড়ি মাথায় করে
ছুতোর বাড়ী যাই।
ছুতোব ভাই, ছুতোর ভাই,
ঘরে আছো হে,
আমার তোষলা স্বাদ খাবে
ভালো চিঁড়ে চাই।

এই ভাবে দই, মুড়কি, মিষ্টি, ভালো শাড়ী, লোহা, সিঁদুর, আলতা প্রভৃতি কিনে আনবার জন্য প্রয়োজন মতো ঐ মন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন সওদাগরের যথা গয়লা, দোকানী, বোষ্টম, ময়রা প্রভৃতির বাড়ী

যাওয়ার কথা বলতে হয়। তারপর যথারীতি ফুল তোলার মন্ত্র, ফুল দেওয়ার মন্ত্র, সঙ্গে কামনা বাসনার প্রকাশঘটিত মন্ত্র বলা হয়। ফুল তোলার মন্ত্রে একটু রকম ফেরও ঘটতে দেখা যায় কখনও কখনও—

সরষে বাড়ীতে দেখে এসেছি
দ্বিতীয়ের চাঁদ,
গায়ে গামছা দিয়ে—হাতে
গোছা গোছা পান।
মটর বাড়ীতে দেখে এসেছি...।

প্রতিদিন শেষ রাতে পূজার শেষে শাঁখ বাজাতে হয়। স্বাদ দেওয়ার পর শাঁখ ঘণ্টা ঝাঁঝর বাজিয়ে আনন্দ করে স্বাদ-এর প্রসাদ সকলকে বেঁটে দেওয়া হয়। ঐ স্বাদ ভক্ষণের রাত ভোর না হতেই বিসর্জনে যেতে হয়।

শীতের ভোর থেকে শাঁখ বাজতে থাকে, ঘণ্টা বাজে, হুলুধ্বনি ওঠে পাড়ায় পাড়ায়। গঙ্গা বা অন্য কোন নদী বা খালে বিলে পুষ্করিণীতে তষলা ভাসানো হয়। ভোরেই ভাসাবার নিয়ম, সূর্য ওঠার আগে। লোকবিশ্বাস এই যে কাককোকিল দেখতে পেলে মাসাবধি তষলা সরায় রাখা ফুলে পোকা ধরে যাবে। কিন্তু দূর নদীতে ভাসাতে গেলে সকাল তো হয়ে যাবেই। কাছাকাছি হলে নদীতে যাবার আগ্রহই বেশী, কারণ নদীর ঘাটে ঘাটে মকর মেলা জমে ওঠে। বেছে বেছে কুমারী মেয়েদের মধ্যে মকর পাতানের সুযোগ হয় নদীব ঘাটে বেশা। তষলা ভাসানো ও মকরস্নান একই সঙ্গে হয়।

তষলা ভাসিয়ে এসে ব্রতচারিণীকে ঘরে 'ছবড়ি' পিঠে খেতে হয়। কুলকাঠ আর 'ছবড়ি' ঘুঁটে জ্বেলে আগুন পোয়াতে হয়। ছবড়ি ঘুঁটে গোবরের সঙ্গে নবান্নের কুঁড়ো মিশিয়ে তিন আঙুলের

ছাপ দিয়ে করতে হয়। আর ছবড়ি পিঠে তৈরী করতে হয় চাল গুঁড়ি, নারকেল কোরা, বিরির ডাল বেটে এক সঙ্গে মিশিয়ে। এটি ভাজা পিঠে। এই পিঠে দুধে ডুবিয়ে রাখতে হয়। পিঠে খেতে খেতে বলতে হয়—

ছবড়ি পিঠে দুধে মিঠে
গাঙ সিনানে যাই।
গাঙের বালি সরু চাল
তুলে তুলে খাই।

হুগলী জেলার গঙ্গা বা নদীর ঘাটে তুষুর কোন মূর্তি দেখিনি তবে কোথাও কোন ঘাটে মকরবাহিনী গঙ্গামূর্তির পূজা হয়।

পরপর তিন বছর বা চার বছর তষলা পূজার পর 'উজ্জোবন' (উদযাপন) করতে হয়। পাঁচ বছরেও উদযাপন হয়, তবে চার বছরে করাটাই ভালো। রাস বা কার্তিক পূজা প্রভৃতি চার বছরেই উদযাপন হয়। উদযাপনের দিন তষলা ভাসিয়ে নদীর ঘাটে খেজুর গুড়ের মোয়া ও মিষ্টি কিনে বিলিয়ে দিতে হয়, আনন্দ করে অপরকে খাওয়াতে হয়। খেজুর গুড়ের মোয়াটা অবশ্যই চাই। এই উদযাপনের বছরেই সাধারণতঃ মকর পাতাতে হয়। এই উদযাপনের উপলক্ষেই তুষু পূজারিণীর বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া, অতিথি অভ্যাগত, বাদ্যি বাজনার বিশেষ আয়োজন হয়।

বাঁকুড়া জেলায় তুষু পূজা গানে গানে, ছড়ায় নয়। এখানে তুষু পূজা হয় পৌষ মাসের প্রতি রাত্রের প্রথম প্রহরে, হুগলীর মতো রাত্রি শেষে বা ভোরে নয়।[৪৪] তুষু তোলা হয় ঘট, সরা,

৪৪ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন—তুষু পূজা হয় শীতের 'সকালে'। তিনি বলেছেন—'পূর্ববঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে দু'জায়গায়ই এই ব্রতের চলন আছে। প্রতিদিন পৌষ মাসের সকালে মেয়েরা এই ব্রতটি করে।' পৃ ২৭, বাংলার ব্রত, ১৩৫৪

খলা (আলোখলা) প্রভৃতিতে। তারই সঙ্গে তুষুমূর্তির পূজার প্রচলন আছে বিশেষভাবে। বাঁকুড়া জেলা-শহরে তুষু পূজা বহুল ভাবে প্রচলিত থাকলেও তুষুমূর্তির আবির্ভাব ঘটে না তেমন, যদিও ভাদ্র মাসে এই শহরে ভাদু মূর্তি বিক্রী হয় রীতিমতো দোকান সাজিয়ে (যেমন লক্ষ্মী বা কার্তিক মূর্তি বিক্রী হয় কলকাতার শিয়ালদা-বউবাজার অঞ্চলে)। তুষু খলা বা মূর্তির সঙ্গে আর একটি বিশেষ জিনিষ থাকে, তাকে বলে 'চৌদল'[৪৫]। নানা রঙের কাগজ, বাঁশ কাঠির খাঁচায় জড়িয়ে চৌদল করা হয়, দেখতে অনেকটা পালকির মতো। হাতে, কাঁকালে, অথবা মাথায় করে মূর্তি নিয়ে আর চৌদল কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

বাঁকুড়ায় তুষুর পূজা গানে গানে, উৎসবও গানে গানে। কত যে গান তার সীমা সংখ্যা নেই। একক বা দল বেঁধে গাওয়া হয়। এই সব গানে যেমন আছে কামনা বাসনার প্রকাশ তেমনি আছে কবিত্বের ঐশ্বর্য, আর আছে জীবনের প্রায় সব রকম বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য।

পৌষ মাসের প্রতি সন্ধ্যায় তুষু পূজার সময় ব্রতচারিণী প্রথমে গায় জাগরণের গান—

উঠ উঠ উঠ তুষু, উঠ্ করাতে এসেছি।
তোমার সব সখীগুলি তুষু পূজতে বসেছি।
চাঁদকে যেমন তারায় ঘিরে তেমন ঘিরণ ঘিরেছি।

৪৫ চতুর্দোলা > চৌদল। একে 'তুষুর ভেলা' ও বলে। রঙীন কাগজ, সোলা ও বাঁশকাঠি দিয়ে অপূর্ব সব 'ভেলা' তৈরী হয় বিষ্ণুপুরে। পৌষ সংক্রান্তি যত এগিয়ে আসে ততই রকমারি ভেলায় বাজার (চকবাজার, বিষ্ণুপুর) অঞ্চল, রাস্তার দুপাশ সাজিয়ে 'ভেলা' বিক্রী হয়। 'ভেলা' দেখতে ৫ বা ৯ চূড়া মন্দিরের মতো। মনে হয়েছে, বিষ্ণুপুরের টেরাকাটা মন্দিরের প্রভাবজাত।

পূজার ফুল, তুঁষ, গোবর নাড়ু, দুর্বাঘাস দিয়ে পূজা করতে হয়। তবে হুগলী জেলার মতো ফুল তোলার গানের নিয়ন্ত্রিত নিয়ম এখানে শুনিনি, যদিও ফুল তোলার কথা আছে এবং সে গানে হুগলী জেলার ছড়ার মতো শিবদুর্গার দেখা পাওয়া যায়। যেমন—

চাঁপা গেঁদাটি তুলতে গেলম তুষলা মায়ের তরে
তার তলাতে হরগৌরী সদাই নিত্য করে।
ছাঁচা কোলে দুর্বাঘাস লহ লহ করে।
আজ আমাদের কি সৌভাগ্য শিবদুর্গা ঘরে।

সন্ধ্যাকালীন তুষুর আসরে যার যত গান জানা আছে পর পর একক বা দল বেঁধে গেয়ে যাওয়া হয়। পৌষ মাসের প্রতি সন্ধ্যায় এমন গানের একটানা সুরে ভরে ওঠে হিন্দু গৃহস্থের ও উপজাতি তপশীলী মানুষদের বাড়ীর উঠোন। গানে গানে ভক্তি নিবেদন ও বর প্রার্থনা শেষ হলে প্রতি দিনই গাওয়া হয় সমাপ্তির গান, সে গানে থাকে আগামী দিনের জন্য আহ্বান—

আজ থাকো মা নন্দরাণী আনন্দ হয়ে,
আবার তোমায় পূজবো মোরা
যা পাই তাই দিয়ে গো—
যা পাই তাই দিয়ে।

মাসের প্রথমের দিকে শুধু এক বাড়ীর একজন বা দুজন ব্রত-চারিণী, তারা সবাই বালিকা কুমারী। তারপর তারিখ যত বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে তাদের গায়কী দলের সংখ্যাও বাড়তে থাকে, এ বাড়ী ও বাড়ী গিয়ে দল বেঁধে তুষু গান গাওয়া আরম্ভ হয়। অবশেষে এ পাড়ার মেয়েরা যায় অন্য পাড়ায়। সধবা মেয়েরাও বয়স নির্বিশেষে যোগ দেয়, যোগ দেয় প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধারাও। তুষু গানে যখন মাসাবধি বাঁকুড়ার জনমণ্ডল উত্তাল হতে থাকে তখন ছেলেরাও পিছিয়ে থাকে না, তাদের দ্বারা পাড়ায় পাড়ায় তুষুমূর্তি

প্রতিষ্ঠিত হয়, চৌদল বানিয়ে সাজানো হয় পরম যত্নে। ছেলেরাও গান স্মরণ করে, শিখে নেয়, গাইতে থাকে বিপুল আগ্রহে। পৌষ সংক্রান্তি সমাগত, ব্রত পালনের নিভৃত মানস অবশেষে উৎসবের উত্তালতার জন্যে প্রস্তুত হয়। ব্রত পরিণত হয় সার্বজনীন উৎসবে। পৌষ সংক্রান্তির আগের রাতে শেষ পূজা করেন ব্রতিনীরা। মিষ্টান্ন ফল ও ফুলে আঙিনা ভরে ওঠে যার সাধ্য সেই অনুসারে। যে তুষুর সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়ে এক মাস ধরে যোগ গভীরতর হয়েছে সেই তুষুকে আগামী ভোরে বিদায় দিতে হবে। কেঁদে ওঠে বালিকা হৃদয়, রমণী মন। তাদের ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে কান্নার সুর ফোটে—

তিরিশ দিন রাখিলম মাকে
তিরশলতা[৪৬] দিয়ে গো,
আর রাখিতে লারলাম মাকে
মকর আইচেন লিতে গো।
চাঁচি খাও মা—ছেনা খাও মা[৪৭]
ওদর ভরিয়ে,
কাল সকালে চলে যাবে
দেশের লোককে কাঁদিয়ে।
এগু কাঁদে মায়ে বাপে
তাপর কাঁদে সোদর ভাই...॥

কিন্তু এই বেদনা বিহ্বল বিচ্ছেদই শেষ কথা নয়। পৌষ সংক্রান্তির ভোরে তুষুর খলা মাথায় দিয়ে জলাশয়ের দিকে চলে মেয়েরা। তুষুর খলা ভারি সুন্দর। এক তলা, দু তলা, তিন তলা পর্যন্ত প্রদীপের সারি গোল করে বসানো হয়—মাটির তৈরী এই

৪৬ তেলসলিতা। কোথাও শুনেছি 'একুশ দিন রাখিলাম মাকে একুশলতা দিয়ে গো'। একুশ দিন কেন প্রশ্ন করেও উত্তর পাইনি।
৪৭ শুধু মণ্ডামিষ্টি নয়, কখনও মুলামুড়িও দেওয়া হয় তুষুকে।

প্রদীপগুলি জ্বেলে দিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হয় নিথর কালো জলে সারা জলাশয় জুড়ে বা নদী স্রোতে ভাসতে ভাসতে যখন দীপশিখার মালা কাঁপতে থাকে তখন আনন্দের রেখা জাগে দর্শকের মুখে, মন ভরে ওঠে খুশীতে। তুষুর খলা ভাসিয়ে অবগাহন স্নান সেরে উঠে আসে ব্রতচারিণী। ছেলেরা খড়, বাঁশ পাটকাঠি বেঁধে বিরাট গাছ তৈরী করে রাখে, অথবা 'ম্যাড়া ঘর,'[৪৮] তাতে আগুন দিয়ে বহ্নুৎসব চলে এবং আগুন গোহায় শীতার্ত ব্রচারিণীরা। মকর পাতানো চলে। গানে গানে শুনি—

ত্রিশ দিন রাখিলাম মাকে ত্রিশ সলতা দিয়ে গো,
আর রাখিতে লারলাম মাকে, মকর এস লিতে গো।
এসচো মকর বেশ করেছো, তুষু রাখবে যতনে,
আমরা সবাই আনতে যাবো পৌষ মাসের প্রথমে।

আগামী বছরে পৌষ মাসে পুনরায় তুষু আহ্বানের প্রতিশ্রুতি দেবার পরও পূজারিণী নিজের কথা ভুলতে পারে না। ব্রতের পরম ফল প্রাপ্তির কথা স্মরণ করে—'হাতের শাঁখ সিথায় সিঁদুর স্বামীকে অমর' করার বর চেয়ে নেয়। ধনে পুত্রে যেন সুখী হই, যেন নাতিনাতনই ঘর জুড়ে থাকে জামাই যেন রাজাধিরাজ হয়, মেয়ে হয় রূপফোটা আর ভাই হয় রত্নাকর। ধন সাগুরে মা, অমর গুরু বাপ, রাজ্যেশ্বর স্বামী দরবার শোভা বেটা—এ সব পাবার জন্যই তো নিত্য তুষু ব্রতের অনুষ্ঠান করেছে কুমারী ব্রতচারিণী। অবশেষে—

তুষ্ তুষ্‌লা ক্যান্ তুষ্‌লা তুষ্‌লা গো রাই—
তোমার দৌলতে আমরা ছবড়ি পিঠা খাই।

---

৪৮ ম্যাড়া ঘর অর্থাৎ ভেড়ার গোয়াল। ভেড়ার গোয়ালে আগুন-গোপ-শ্রেণীর প্রভাব। মেড়ালি গোপ ও পূবালি গোপ এই দু শ্রেণীর আদিবাসী গোপ জাতির প্রাধান্য আছে বাঁকুড়ায়।

ছবড়ি লবড়ি [৪৯] গাঙ সিনানে যাই
গাঙের জলে রাঁধি বাড়ি মকরের জল খাই।

ব্রত থেকে প্রীতি-ভক্তি, প্রীতিভক্তি থেকে বিদায়ী বেদনা বিষণ্ণতা, তার থেকে উৎসবের আনন্দময় জগতে পৌঁছে দিয়ে তুষু পরব শেষ হয়। সে আনন্দ যে কত গভীর, কেমন উত্তাল তার বর্ণনা পোরকুলের মেলা প্রসঙ্গে পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। শুধু পোরকুলে নয়, বিষ্ণুপুর শহরের লালবাঁধের তীরেও ঐ রকম বাদ্যিবাজনা মাইক সহযোগে মেলা জমে ওঠে। দূরাগত বহিরাগত মানুষের পক্ষে বিষ্ণুপুরের তুষুপরব ও তুষুমেলা দেখার সুযোগ সুবিধা অনেক বেশী। এবং বিষ্ণুপুরের নিকটে প্রাচীন গ্রাম ডিহরেও পোরকুলের মতো বিখ্যাত তুষু মেলা বসে।

৪৯ 'ছবড়ি লবড়ি পিঠা' ব্যাপারটি অনুধাবনযোগ্য। প্রায় সব পণ্ডিতই বলেছেন ছ'বুড়ি ন'বুড়ি (ছয় বুড়ি নয় বুড়ি) পিঠার কথা। পিঠার সংখ্যা নিয়ে তাঁরা ভেবেছেন, কিন্তু হুগলীর গ্রাম থেকে জেনেছি 'ছবড়ি' পিঠা এক বিশেষ ধরণের পিঠা, 'ছবড়ি' ঘুটেও তাই। সেটিই সত্য বলে মনে হয়। কারণ ছ'বুড়ি পিঠা খাওয়া কি সম্ভব? ছ'বুড়ি মানে ২০ × ৬ = ১২০, ন'বুড়ি মানে ১৮০।

৮· তুষু গানের কলারীতি, কাব্যসৌন্দর্য, উপাদান

সমালোচনার অভিজাত নিয়ম পদ্ধতি মেনে তুষুগানের কলা-রীতি, উপাদান, কাব্যসৌন্দর্য সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করতে গেলে অনেকের কাছে তা বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে। তাঁরা বলতে পারেন গ্রামবাংলার মাঠে ঘাটে বাটে গৃহে গঞ্জে যে গান স্বতই সৃজিত ও উৎসারিত হচ্ছে, যে গান স্বভাব-কবিদের রচনাও নয়, যারা এই সব গান রচনা করেছে এবং করছে, তারা কোনদিন নিজেদের কবি বলে মনে করেনি, যে গান প্রাকৃতিক নিয়মে আরণ্যক ফল ফুলের মতো অসংখ্য পরিমাণে মনের ও স্মৃতির বোঁটায় ধরে এবং ঝরে পড়ে, সেই সব গানের মাপকাঠি হিসাবে রীতিসম্মত সমালোচনার বিধান ব্যবহার করার কোন মূল্য নেই। কথাটি সত্য, কিন্তু সার্বিক সত্য নয়। ঝরে পড়া গানের কয়েক মুঠো কুড়িয়ে এনে বিচার করে দেখলে স্তম্ভিত না হলেও আনন্দিত হতে হয়।

এমন কোন কথা নেই, এমন কোন ভাবভাবনা নেই, এমন কোন আনন্দ বা বেদনা নেই যা তুষুকে না জানানো যায়—গানগুলি আলাদা ভাবে পড়ে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয়। সখীর সঙ্গে সখীদের প্রাণে প্রাণে যত ভালোবাসা, কানে কানে যত গুঞ্জরণ, তুষুর সঙ্গে সাধারণ নরনারীর তত ভালোবাসা তত গুঞ্জরণ। প্রাচীন ও আধুনিক, ঐতিহাসিক সামাজিক ও পৌরাণিক, ব্যক্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক কত বিষয় নিয়েই না তুষুর গান রচিত হয়েছে। এই সব গানের রচয়িতা কারা? আবহ-মান কাল ধরে কত বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা এই সব গান রচনা করেছে। কিন্তু গানগুলিতে ভনিতা দেবার প্রয়োজন মনে করেনি। ভণিতাহীনতাই তুষু গানের বিশিষ্ট

কলারীতি।[৫০] কোন একজন কবি এখানে মাথা উঁচু করে বড় হয়ে দেখা দিতে চায় নি। যারা তুষুব্রত পালন করবে, যারা গানে গানে মাতাল হবে, যারা উৎসব প্রাঙ্গণ ভরিয়ে তুলবে কলউচ্ছ্বাসে, তাদের মুখে গান যোগান দেবার জন্যই গান রচয়িতাদের প্রচেষ্টা, তার বেশী কিছু তারা চায় না। পূর্বে যেমন কত না গান রচিত হয়েছে, আজও তেমনি হচ্ছে, ভবিষ্যতেও তেমনি রচিত হবে। আর তুষু গানের রাজ্যে না এলে এর সম্বন্ধে জানার অনেকখানিই বাদ পড়ে যায়। সুর-ছাড়া তুষু গানের কথাকে খাতা বোঝাই করে যাঁরা টুকে নেন, তাঁরা হয়তো এই সব গানের উপাদানবৈচিত্র্য অনুধাবন করতে পারবেন, কিন্তু ধারণা করতে পারবেন না তার প্রাণময় সত্তাটিকে। তুষু-গানে ভণিতা নেই বলেই ব্রতচারিণী বা গায়কের কাছে সে সব গান নিজস্ব গানে পরিণত হয়েছে, গানের সঙ্গে একাত্মতা লাভে কোন বাধা থাকে না।

একটি বা দুটি পংক্তির তুষু গান যেমন আছে তেমনি আট দশ পংক্তির তুষু গানও আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কোন কোন তুষু আলোচনা ও সংকলন গ্রন্থে প্রায় সব গানকেই দু'পক্তির দেখানো হয়েছে, যদিও প্রকৃত পক্ষে তা নয়।[৫১] সাধারণত তুষু গানে দেখা যায়, কোন একটি ছোট গানের সঙ্গে অন্য একটি গান যুক্ত হয়ে গেছে, কোথাও বা একটি বড় গানের মাঝখান থেকে কোন না কোন-পংক্তি হারিয়ে গেছে।

৫০ অবশ্য দু'একটি গানে রচয়িতার নাম যে সংযুক্ত হয়নি তা নয়, কিন্তু সেগুলি ব্যতিক্রম। এবং এই ধরণের প্রবণতা সাম্প্রতিক কালে দেখা দিচ্ছে।

ভাব বা অর্থ অনুযায়ী মিশ্রিত গানগুলি পৃথক করা উচিত বলে
মনে হলেও পৃথক করা সম্ভব হয় না। তবে এই সব বিচ্যুতি
অতিক্রম করলে দেখতে পাওয়া যায় তুষু গানের মধ্যেও ভাষার
বিন্যাসকৃতিত্ব, শব্দচয়ন ও গঠনকৃতিত্ব ও চারুত্ব আছে, কথা
বলার রকমারি নিপুণতা আছে। কবি-প্রতিভার অধিকারীরা
এগুলি রচনা করেন নি, তবু এগুলির মধ্যেও পাওয়া যাবে
রূপক উপমা অলংকারের ঐশ্চর্য। ছন্দের সুনিয়মিত সংস্থাপন
গানের মধ্যে অনেক সময় দরকার হয় না। তবু কোথাও কোথাও
অন্ত্যমিল সুন্দর ধ্বনিসামঞ্জস্য এনেছে—

মলিন কেন মুখশশী, ও তুষু ধন কও কথা।
কি হয়েছে মনের বেদন, বল কি মনের ব্যথা?

অথবা

এ নদী যাই ও নদী যাই কোন্ নদীতে করি স্নান,
সোনারবরণী তুষু হয়ে গেল অন্তর্ধান।

অথবা

তুই কি পারবি আমাকে?
লিরিপুরে লিরিছুঁড়ি সেই লেরেছে আমাকে?

অথবা

তুই করিস না ফটর ফটর
তোর হুয়ারে চালাবো মটর।

এই ধরণের তুষুগানে ব্যবহৃত অন্ত্যমিলের সহজ নিপুণতা
শ্রুতিসচেতন করে তোলে। তুষু গানে ব্যবহৃত ছন্দ সাধারণত
চার অক্ষরে চার মাত্রার ছড়ার ছন্দ। ছড়ার ছন্দের প্রধান
বৈশিষ্ট্য প্রতি পর্বের শুরুতে শ্বাসাঘাতের দোল। এই দোলটিকে
আয়ত্ত করা সহজ। ব্রতচারিণী কুমারী মেয়েদের পক্ষে হুলে হুলে
তালে তালে গান করায় তাই কোন জটিল বাধা থাকে না

টুষু গানে ঐ দোলটিকে জাগিয়ে রাখতে তাই অন্ত্যমিলের চাতুরী থেকে বেশী চাতুর্য দেখা যায় মধ্যমিলে। শব্দালংকারের প্রাচুর্যও সেই কারণে। কয়েকটি উদাহরণ—

* মান্‌কানালি ছোকের কুলি ছোক বিলায় কুলি কুলি।
* তুষ্‌ তুষলা ক্যান্‌ তুষলা তুষলা গো রাই।
* এ চালে পুঁই, ও চালে পুঁই, খাব পুঁয়ের মেচুড়ী।
* বানের উপর বান চেপেছে তার উপরে ভগবান।
* আটচালা চণ্ডীমেলা বাসক কুলের বিছানা।
* জুঁই চামেলি চাঁপার কলি বেল বেলা গেঁদা ফুল।
* কে কাঁদে কে কাঁদে কে কাঁদে দালান ধরে।
* টুসুর পায়ে সোনার নূপুর বাজছেরে অশোক বনে।

শুধু শব্দালংকার নয়, কবিতা যেখানে প্রাণ পায় সেই অর্থালংকারের সৃজনশক্তিও টুষু রচয়িতাদের মধ্যে অবারণ ভাবে আছে। আধুনিক কবিতার সঙ্গে এই সব চাতুর্যের সহযোগিতা নেই, কিন্তু নিজস্ব ক্ষেত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এগুলি সত্যই মধুর। শিউলি ফুল ঝরে ঝরে পড়ছে—শরৎপ্রকৃতির এই সৌন্দর্যবৃষ্টি কোন্‌ কবি না বর্ণনা করেছেন। কিন্তু গায়িকা যখন বলেন—'শেফালিকা পুষ্পখুশী', তখন শিউলি গাছের খুশী, ফুলের খুশী, পুষ্পপ্রেমিকের খুশী, শরৎপ্রকৃতির খুশী এক হয়ে যেন মিশে যায়। বৃন্দাবনের কৃষ্ণের সঙ্গে কালো মেঘের তুলনায় পদকর্তারা কখনও ক্লান্ত হননি। টুষু রচয়িতারা সেই ঐতিহ্যে ওয়াকিবহাল নয়, তবু তাদের বর্ণনাতেও বৈষ্ণব পদকর্তাদের প্রকাশভঙ্গি ধরা পড়ে 'মেঘ নয় গো কালো সোনা' উক্তির মধ্যে। ভাত যে রাঁধছে সেই সুন্দরী রূপসীর সঙ্গে চাঁদের তুলনা করলে একাধারে রূপক্ষুধা ও প্রীতিক্ষুধা মেটে, কিন্তু চাঁদের আলো কিসের প্রতিতুলনা? ঝকঝকে করে মাজা কাঁসার থালায় চুড়ো করে সাজানো সাদা

সাদা ভাতের সঙ্গে কি? রসসন্ধানী রসিক মন তুষু গানে পংক্তিতে পংক্তিতে এই ভাবে সৌন্দর্য খুঁজে ফেরার সুযোগ পায়—

* শেফালিকা পুষ্পখুশী পড়ে গো অভিরত।

* কদমতলায় মেঘ নেমেছে, মেঘ নয় গো কালোসোনা।

* যেন পুন্নিমা চাঁদের আলো,

ভাত রাঁধে গো সজনী ভালো।

কবিতা হচ্ছে ছবি ও গানের অঙ্গাঙ্গী সমাহার। তুষুর সঙ্গে গানের যোগ কোন বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। তুষু আর গান সমানার্থে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য তুষু গানের সুরের মধ্যে বিভিন্ন ধরণ আছে। সুর কখনো ছড়াধর্মী, কখনো লয় তাল সহযোগে বৈঠকী গানের রীতি অনুসারী। কখনো নৃত্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বচ্ছন্দে পরিবেশিত হয়।[৫২] কখনো সমবেত কণ্ঠে উল্লাসে ফেটে পড়তে চায় তুষু গানের আনন্দ।[৫৩] অন্যদিকে সূক্ষ্ম স্থূল নানা ছবি রচনা করার তৎপর চাতুর্য তুষুগানের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। সেটিই বিস্ময়কর। এই চাতুর্যের বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, কবিত্ব কোন ব্যক্তিবিশেষের অধীত বা উপ- স্থাপিত অধিকার নয়। মানুষের সহজ ভাবনাভঙ্গির মধ্যে কবিত্ব বিদ্যমান। তুষু রচয়িতা সাধারণ নর নারী (প্রধানতঃ নারী) কত অনায়াস ভঙ্গিতে স্বল্প দু'একটি রেখায় ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারে তার উদাহরণ দিই—

* কয়লাখাদের ময়লাবাবু সেউ করে তুষু পূজা।
* আসছে বাবু ছড়ি হাতে মাঝখানে বাঁকা সিতা।
* চাদর ঢাকা মদের বোতল ডান হাতে বাদাম ভাজা॥
* ফুল চিরুণী আরশি হাতে বস মা লাল চৌকিতে।
  মাথায় দাও মা সীতা, লক্ষ্মী, তোমারই রাম এসেছে॥
* শিবের একটি কাঁকাল চুল তাতে কাশমল্লিকের ফুল।
* আচিরে পাচিরে পদ্ম পদ্ম বই আর ফোটে না,
  তুষুর হাতে জোড়া পদ্ম ভ্রমর বই বসে না।
* নাড়ের শাঁখা কাঁকাল বাঁকা কলসী নিয়ে জলকে যায়।
* আয়না আনতে বায়না দিলম তবু আয়না এল না।
  দাঁতে মিশি,[৫৪] চোখে কাজল, মুখ দেখিতে পেলাম না।
* আমার তিষু মুড়ি ভাজে চুঁড়ি ঝলমলে করে গো।
* তোমার সব দাসীগুলি তুষু পূজতে বসেছি।
  চাঁদকে যেমন তারায় ঘিরে তেমন ঘেরণ ঘিরেছি॥
* আমার তুষু হাল ধরেছে ডাইনে বাঁয়ে লাল গরু,
  বেছে বেছে রাখবো কামিন দাঁতে মিশি কোমর সরু॥

এই সব ছবি সযত্ন সাধনায় ফুটিয়ে তোলা হয়নি, তবু ভাষাচিত্র হিসাবে এগুলিকে উপেক্ষা করার মতো উন্নাসিকতা কোথাও মিলবে না। কয়লা খনিতে কাজ করে সারা অঙ্গে কয়লার গুঁড়ো মেখে 'ময়লা বাবু'র রূপটি কত চমৎকারই না ফুটে উঠেছে। আর দ্বিতীয় উদাহরণের ঐ বাবুটিকে আমরা দুশো বছর ধরে কাব্যে উপন্যাসে আঁকতে চেষ্টা করেছি নববাবুবিলাসে বা আলালের ঘরের দুলালে বা একেই কি বলে সভ্যতায় বা সধবার একাদশীতে বা হুতোম প্যাঁচার নকশায় অথবা কমলাকান্তের দপ্তরে। কিন্তু গ্রাম্য অশিক্ষিত তুষু রচয়িতা যেমন স্বল্প রেখায় বাবুটিকে ফুটিয়ে তুলেছে

৫৪ এখানে 'নিশি'ও বলে।

সেরকম স্বল্প আয়োজনে বোধ হয় কালিঘাটের পটুয়ারাও পারেন নি। শুধু সমাজ চিত্র নয়, নর নারীর রূপচিত্রও সুন্দর অঙ্কিত হয়েছে তুষুগানে। শিবের এলায়িত জটায় কাশমল্লিকের (কাঠ মল্লিকা?) ফুল, সীতার লাল চৌকিতে বসে মাথা বাঁধার দৃশ্য, তুষুর হাতে জোড়া পদ্ম, দাঁতে মিশি কোমর সরু কামিন, সোনার চুঁড়ি ঝলমলিয়ে মুড়ি ভাজা প্রভৃতি রূপচিত্রণ কাছের মানুষকে যেমন অপরূপ করে দেখিয়েছে তেমনি পৌরাণিক চরিত্রকে ও কাছে এনেছে। তারই মধ্যে বৈধ অবৈধ রঙে মেশা একটি নারীরূপ এমনি কুশলতায় ফুটেছে যার তুলনা হয় না—'নাড়ের শাঁখা কাঁকাল বাঁকা কলসী নিয়ে জলকে যায়'। বিধবা মেয়ের হাতে শাঁখা—এই উক্তিগত দৃশ্য তুষুগানে বারবার দেখা গেছে। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত উক্তিটিতে কাব্যছন্দ ও চলমান ছবি যতখানি জীবন্ত হয়েছে অন্য উক্তিগুলিতে ততখানি হয়নি। এই সব চারুকলা সম্মত ও কাব্যজীবিত গানের রচয়িতা বা গায়কেরা কিন্তু নিজেদের 'কবি' বলে দাবী করেন না। এবং একথাও স্মরণ রাখতে হবে, এদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা কবি।

তবে এই সব বাছাই করা কুশলতাই তুষু গানের শেষ পরিচয় নয়। তুষু গানে প্রৌঢ়ী কাব্যরীতির চেয়ে স্বভাব পটুত্বের উদাহরণ বেশী, তার অনেক বেশী অপটু বিকাশের উদাহরণ। কথা ও আন্তরিক আবেগ এখানে অনেক সময়েই সন্ন্যাস্ত হয়নি। ভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এলোমেলো, গুছিয়ে বলার সংযম ও সাধনা নেই। একই গানের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ প্রচলিত আছে—একই অঞ্চলে, এমন কি একই পাড়ায় বা একই পরিবারের পরিজনদের মধ্যে। তুষু গানের কোন লিখিত রূপ নেই [৫৫]। গান গাইবার

৫৫ অবশ্য খুব ছোট ছোট চটি বই পৌষ মাস জুড়ে গ্রামে গঞ্জে বিক্রী হয়, যার মধ্যে গ্রাম্য ছাপাখানা থেকে তুষু গান ছাপিয়ে বাঁধাই করা হয়েছে, কোন অর্থ ও প্রচারলোভী গায়কের দ্বারা।

সময় লিখিত রূপের উপর নির্ভর করা হয় না[৫৬]। গানগুলির অধিকাংশই বহু যুগ ধরে স্মৃতিনির্ভর বলে মুখে মুখে ভাষার ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। তবু সব থেকে বড় করে চোখে পড়ে সরল মনের নিরাবরণ উচ্চারণ। হৃদয়ে মনে ও মুখের ভাষায় প্রকাশনার মধ্যে কোন কৃত্রিম বিভেদ নেই।

তুষু গানে যেমন আছে আত্মসমীক্ষা, তেমনি আছে সমাজ সমীক্ষা। তুষু যেমন ব্যক্তিগত কুমারীব্রত তেমনি সামাজিক উৎসব। ব্রতচারিণীরাও সামাজিক মানুষ। তাদের মনের প্রতিফলন ঘটেছে এখানে। সেই সব মন রয়েছে উন্মেষ লগ্নে—কারণ ব্রতচারিণীরা সবাই বালিকা কুমারী। সমাজকে চিনে জেনে নেবার ইচ্ছা এই বয়সেই স্বাভাবিক, জীবনকে পাওয়ার চেতনা এই বয়সেই জাগে। ব্রতচারিণীদের ছড়া বা গানের মধ্যে তাই বাসনাপুরণের ও বরপ্রাপ্তির কথা এতবার করে ফিরে ফিরে আসে। আমাদের হিন্দু-বিবাহের সংযত মন্ত্র যে ভয়ংকর গুরুগাম্ভীর নয়, সুখী সুন্দর কবিত্বময় কথাবার্তা আছে, সংস্কৃত ভাষার বাধায় তা আমরা জানতে পারি না। কালী ও দুর্গাকে নিয়ে শ্যামাসংগীত ও আগমনী বিজয়া রচিত হলেও, পূজা নিবেদনের সময় সংযত ভাষার ব্যবধান রক্ষা করেছি। কিন্তু তুষু ব্রতের পূজা ও গান একই। এই অভিন্নতার জন্য তুষুর মধ্যে সমাজ মানসটি যত সরাসরি এসেছে অন্যত্র ততখানি আসেনি। তুষুগানে সমাজদৃষ্টি সর্বত্র সজাগ। তুষু গানের গায়িকা, রচয়িতা, শ্রোতা সকলেই সমাজের সঙ্গে এমন অনায়াসে লগ্ন যে তুষু দূরের দেবী হয়েও অনেক বেশী ঘরের মেয়ে। ধান দিয়ে লক্ষ্মীপূজা হয়, কিন্তু ধান নয়, ধানের সামান্য

৫৬ মেলাতে দেখেছি হাতে বই নিয়ে গান চলছে, কিন্তু তারা যে বইয়ের গানই অবিকৃত ভাবে গাইছে তা নয়।

তুষ দিয়ে হয় তুষু পূজা। ভূমিলক্ষ্মী তুষুর, উৎপাদনের দেবী—শস্য উৎপাদনের দেবী তুষুর দেবী গরিমার চেয়ে মানবী গরিমা তুলনা-মূলক ভাবে বেশী। সেই মানবিত্ব আগমনী-বিজয়া গানের মেনকা উমা-হিমালয়-মহাদেব কেন্দ্রিক মানবিকতার তুলনায় বহুগুণিতক। যে শ্রেণীর মানুষ আগমনী-বিজয়া গান রচনা করেছিল তারা প্রধানতঃ সাধক এবং গায়ক পুরুষ। কিন্তু তুষু রচয়িতারা প্রধানতঃ নারী, সাধিকা নয় ব্রতচারিণী বালিকা, বিধিসম্মত গায়িকা নয়, সহজ মেঠো সুরের অনুরাগিনী। তুষু গানের সমাজদৃষ্টি তাই প্রধানতঃ নারীর বিচার, বিবেচনা, বিস্ময় ও ব্যথার উপর নির্ভরশীল। এই সমাজদৃষ্টি অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রসারিত, গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। কোথায় কি নতুন ঘটছে তার প্রতি আগ্রহ যেমন উতরোল, তেমনি প্রাচীন সংস্কার ও চিরায়ত জীবনবিশ্বাসের প্রতি নিষ্ঠাও অমলিন। যেহেতু সমাজের অত্যন্ত সজীব অংশ থেকে এই সব গানের উৎসার, সেইহেতু তুষু গানে শ্লীল অশ্লীল, ক্রোধ কাম, ঘৃণা বিদ্বেষ, প্রীতি প্রেম প্রভৃতি মানবসম্বন্ধের ও মানব পরিচয়ের আত্মিক উপাদানগুলিকে কৃত্রিম আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়নি বা দূরে সরিয়ে ফেলা হয়নি।

তুষু গানে দূরের প্রতি আগ্রহের মধ্যে কলকাতার প্রতি আগ্রহই সর্বাধিক—

তুষু যাবেক রেল দেখতে কলকেতা সহরে
আমায় ছাড়ে যেতে লারে—
উয়ার মন কেমন কেমন করে।

বাঁকুড়া পুরুলিয়া জেলার গ্রাম গঞ্জ থেকে কলকাতা যাবার ও দেখার আগ্রহ যে কত গভীর তা তুষু গানের সঙ্গে পরিচয় হলেই বুঝতে পারা যায়। ফিরে ফিরে গানে গানে বারবার কলকাতার কথা—

কলকাতা যে গেছলেন তুষু কি কি গয়না উঠেছে
ইলির মিলির ঝিলির কাটা পায়ে পাত্মল পরেছে।
অথবা
উপরে পাটা তলে পাটা তার উপরে দারোগা।
ও দারোগা পথ ছেড়ে দাও, তুষু যাবেন কলকতা।
কলকাতা যে গেছলেন তুষু কি কি সন্দেশ উঠেছে ?
ইলির মিলির ঝিলির সন্দেশ ফুলাম তেলে ছেকেছে।
কলকাতা যে গেছলেন তুষু কার কতটা চুল আছে ?
চুলের কথা বলবো কি আর পিঠ ভেঙে চুল পড়েছে।
কলকাতা যে গেছলেন তুষু কি কি শাড়ী উঠেছে ?
বেনারসী শাড়ী মাগো তার উপরে ছাপ আছে।

এইখানেই শেষ নয়, কলকাতা সম্বন্ধে আরো রকমারী খবর নানা গানে আছে। তুষুকে প্ররোচিত করা হয়েছে ইস্টিসানের বাবুর সঙ্গে মকর পাতাতে, তাহলে ট্রেনে চড়ে কলকাতা যাবার সুযোগ পাবে তুষু। শুধু কলকাতা নয়, হাবড়া, রাণীগঞ্জ, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, পোখরণা,[৫৭] সোনামুখী, কোতলপুর, পোরকুল, গড়াবাড়ী, বেলিয়াতোড়, পুরুলিয়া, বৃন্দাবন প্রভৃতি শহরের প্রতি আগ্রহ ফুটে উঠেছে অথবা ঐ সব শহরের কথা এসেছে তুষু গানে। তারমধ্যে রাণীগঞ্জের সঙ্গে একটি কৌতুকমিশ্রিত বেদনার দৃশ্য

যুক্ত হয়েছে। রাণীগঞ্জের কয়লাখাদের ময়লাবাবুকে দেখে কৌতুক জমেছে, কিন্তু বেদনার দৃশ্যটি মর্মান্তিক—

এক শ' টাকা লিলি কাকা দিলিরে বুড়া বরে।
বুড়ার সঙ্গে চলতে গেলে রাণীগঞ্জের শহরে।
রাণীগঞ্জের লোকে বলে ওটি তোমার কে বটে।
লাজ লজ্জা সরম সজ্জা—ঠাকুরদাদা হয় বটে।

রাণীগঞ্জের সঙ্গে বাঁকুড়ার সাধারণ মানুষের যোগ অনেকাংশে ভাত-কাপড়ের যোগ। বাঁকুড়া থেকে বহু মজুর ও কামিন্ কয়লাখাদে কাজ করতে যায়। আর কলকাতার সঙ্গে যোগ অন্বেষণের ও অপার বিস্ময়ের। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে তো বটেই, স্বাধীনতা পরবর্তী কালেও বাঁকুড়ার কাছে কলকাতা ছিল সত্যই বিদেশ। তাই কলকাতার জন্য এখানের মানুষের অপার ঔৎসুক্য ধরা পড়েছে গানে গানে। শহর নগরের নাম বারবার উচ্চারণের মধ্যে সমাজবন্দিনী নারীদের আর একটি গূঢ় মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। গৃহবন্দী বাঙালী নারীর কাছে এককালে সবই ছিল অধরা দূরবর্তী—'ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ'। তাই তাদের মুক্তিপিপাসু মন তুষুকে দিয়েছে অবাধ স্বাধীনতা, কলকাতা পোখর্না পোরকুল পুরুলিয়া রাণীগঞ্জ যাবার স্বাধীনতা। 'ইস্টিশানের মিষ্টি বাবুর' সঙ্গে তুষুরাণীর বিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও সেই অবদমিত মানসবাসনার বাহ্যিক প্রকাশ—

আমার তুষুর বিয়ে হুব ইস্টিশানের বাবুকে,
ওলো তুষু ভালোই হল চাপবি কত গাড়িতে।

নানা স্থানে বেড়িয়ে এসে নানা উপাখ্যান ও কাল্পনিক কৌতুক-কথা বলার রীতিটিও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে অনেক গানে। যেমন—

বাঁকুড়াতে দেখে এলম ব্যাঙে করে কেছারী,
সাপ দেখে ব্যাঙ পালিয়ে গেল পড়ে রইলো কেছারী।

বাঁকুড়াতে দেখে এলম সোনার পিড়ায় বাঘ বসে
সেবাঘে কি মানুষ খায় মা, বাঘ বসে রঙ দেখে।
বাঁকুড়াতে দেখে এলম শিকড়ে আম ধরেছে,
দুর্গার বিটি সরস্বতী এক হাতে চুল বেঁধেছে।

এই ধরণের Fantacy রচনার মধ্যে তুষু রচয়িতাদের রসিক মনের পরিচয়টি স্বতঃস্ফুট হয়ে উঠেছে।

নারীমনের বিচিত্র বিকাশ ঘটেছে তুষু গানে, এ কথা আলাদা ভাবে বলবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আলাদা করে দেখার প্রয়োজন আছে। বুড়া বরের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার বেদনা নারীসমাজের দীর্ঘদিনের বেদনা, সে কুলীন সমাজেই হোক বা নিম্নবর্ণের হিন্দু-সমাজেই হোক। তাছাড়া অবিবাহিত থাকার বেদনাও কম নয়। অপ্রসঙ্গেও সে প্রসঙ্গ এসে পড়ে—

হ্যায় শিব, হ্যায় শিব, কিসের এত গরব
আইবুড়ো মেয়েছেলের বিয়া দিতে নারো গো,
বিয়া দিতে নারো।

বউ-কাঁটকি শাশুড়ীদের যন্ত্রণা কোন্ পরিবারে ছিল না? গানে গানে একই অভিমান ও অনন্যোপায় ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে। শাশুড়ীর মৃত্যুও কামনা করেছে নিপীড়িত বালিকা বধূর নিঃসহায় নারী মন—

এ চালে পুঁই ও চালে পুঁই খাবো পুঁয়ের মেচুড়ী,
খেতে খেতে খবর এলো, মইচে তুষুর শাশুড়ী।
মরুগ মরুগ আরো মরুগ চন্দন কাঠে পুড়াবো।
চন্দন কাঠে পুড়ি পরে অম্বিকানন ঘর যাবো।

সাধারণ গ্রামঘরের বহুবিধ চিত্রের সঙ্গে এই মৃত্যুকামনার ভয়ংকরতা বাস্তবের সর্বসত্য কাহিনীরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শাশুড়ীর হাতে বালিকা বধূ মার খায়, সহ্য করে কত অত্যাচার, তাই

বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় শাশুড়ী ভুলাবার জন্য কত আয়োজন। তার মধ্যে একটি—

গছা গছা মালা তুব শাশুড়ী ভুলাতে।
ভুল ভুল ভুল শাউড়ী মা দিয়েছেন মালা গো।
মালার শিরে রক্তচন্দন, পদে রক্তজবা গো

কিন্তু শাশুড়ীরা কি এত সহজে ভোলে! তাইতো শ্বশুরবাড়ী যেতে চায় না বধূ—

আর যাবো না শ্বশুরবাড়ী, ধরে ঠুকবেক শাশুড়ী।
এক কিল সইলাম, দু কিল সইলাম,
তিন কিলের সময় সইব না।
এবার যদি মা বাপ আসত,
তাদের পানে চাইতাম না।

নারীমনের আর একটি দুঃখের ইতিহাস রচিত হয়েছে সতীনকে কেন্দ্র করে। সতীন নিয়ে ঘর করার জ্বালা এখনও নারীমন ভুলে যায়নি, তাই তুষু গানে সতীন বিদ্বেষের প্রকাশও দৃষ্ট হয়—

ও পাড়া যেও না তুসু, ও পাড়াতে সতীন আছে।
জল দিলে জল খেও না,
পান দিলে পান খেও না।
পানের ভিতর ঔষধ দিবে, মা বলিতে পাবে না।

বিবাহ, জামাইকে শ্বশুর বাড়ীতে আনা, মেয়েকে শ্বশুর ঘর পাঠানো—এই ত্রিমাত্রিক বিষয় নিয়ে রচিত আগমনী-বিজয়া গানে বাঙালী সমাজ অধ্যুষিত। তুষু গানও গ্রহণ করেছে সাধ-আহ্লাদ, সুখ ও অতৃপ্তির ঐ ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্য। আগমনী-বিজয়ায় কিন্তু তুষু গানের মত সামাজিক সম্বন্ধ ও মানসবৃত্তি জটিল হয়ে ওঠেনি।

সন্তান জন্ম, সন্তান প্রীতি ও পালনের নানামুখী ঘরোয়া কথাও বার বার শোনা গেছে তুষু গানে—

তুষুর মাকে বলেছিলাম, তুষুর বিয়ে দাও না গো,
বিয়ে দিতে ছেলে হল, নাতি কোলে নাও না গো।
নাতি নিলে বেশ করিলে কি কি গয়না দিলে গো ?
হাতে দিলম অঙ্গুরী, পায়ে দিলম তড়া গো।

কন্যার বিবাহ দেবার সঙ্গে সঙ্গে নাতি নাতনী কামনা করে গ্রামীণ মানুষ, বিশেষ করে গ্রামীণ নারী সমাজ। তারই প্রতিলিপি রচিত হয়েছে উক্ত গানটিতে। এর পর আমরা দেখবো জামাই আনার জন্য কত প্রকার উপায় অন্বেষণ। জামাইয়ের জন্য বাঙালী পরিবারে কতই না আলাপ আলোচনা চলে—

বাড়ির নাময় নারকেল গাছটি বারে বারে জল দিব।
একটি নারকেল চুরি গেলে ডাকে চিঠি পাঠাবো।
চিঠি পাঠাই খবর পাঠাই, তবু জামাই আসে না।
জামাই আদর বড় আদর তিন দিন বই থাকে না।
আর তিন দিন থাকো জামাই খেতে দিব পাকা পান।
বসতে দিব শীতলপাটি, তুষু মাকে করবো দান॥

পরিবার রসে ভরপুর এই সব গানের মাঝে আবার খুঁজে পাওয়া যায় অশ্রুলবণাক্ত অপার জলধি। মেয়েকে স্বামীর ঘরে পাঠাবার সময় মা আর মেয়ের চোখ ভরে নেমে আসে 'রো'। তাই শুনি—

জামাই করে আনাগোনা বিটি পাঠা হবে না।
বাপে বলে দেগো পাঠ্ঠে, মায়ে বলে দেবো না।
ভায়ে বলে শিশু বোনটি কাঁদিয়ে পাঠাবো না।

অবশেষে তুষুকে পাঠাতেই হয়। পূজ্য দেবতা তুষু এই ভাবে পরিণত হয়েছে নাড়ীছেঁড়া ধন কন্যায়। কন্যা বাপের বাড়ীতে আর কতদিন থাকতে পারে! জামাই যে আনতে আসছে, বারবার আনাগোনা করছে। অবশেষে অশ্রুসিক্ত পথে চলে যায় মেয়ে

জামাই। তারই মধ্যে সাঙ্গ করতে হয় নানা কর্তব্য কর্ম মিষ্টান্ন পাঠাবার ব্যবস্থাও করতে হয়—

আয়রে ময়রা ধররে ঝাঁঝরা দেরে চিনির পাগ করে,
টুসু যাবেন শ্বশুর বাড়ী দেরে হাঁড়ায় যাত্ করে।

যাবার সময় হয়ে এল। মায়ে ঝিয়ে কাঁদতে বসার পাল শেষ হল। তারপর মেয়েকেই করতে হয় বুদ্ধিমতী না: কাজ—মাকে প্রবোধ দিতে হয়—

আগে যায়রে ভার বাউটি, পিছু যায় রে ডুলি,
দাঁড়ারে ভারীরে, মায়ে বোধ করি।
মা বড় নির্বুদ্ধি কেঁদে কেন মর।
আপনি বুঝিয়া দেখ কার ঘর কর।

বিদায় নিলেও কি বিদায় নেওয়া এত সহজ! মায়ের কান্না মেয়ের কান্নার বুঝি শেষ নেই—

এতদিন যে রইলেন টুসু
মা বলে তো ডাকলে না।
যাবার সময় বায়না নিলে
মাকে ছেড়ে যাবো না।

শুধু বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ী যাবার চিত্রই নয়, শ্ব বাড়ী থেকে বাপের বাড়ী আসার চিত্রও টুসু গানে আ সে চিত্রেও ঘটেছে আনন্দবেদনার মিশ্রণ—

মাথা বাঁধল্যাম, পাতা কাটল্যাম,
বাপের ঘর যাবার লেগে,
গুণের ননদ কাঁদতে বসলো
বাসক ফুলের ডাল ধরে।
আর কেঁদো না গুণের ননদ
আসব মাসের শেষ করে।

বাংলার গ্রাম সমাজের পরিবার চিত্রের আর একটি দিক উন্মোচিত হয়েছে 'বাগাল' চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে। তুষু গানে াম সীতা, রাধা কৃষ্ণ ললিতা, শিব দুর্গা প্রভৃতি পৌরাণিক রিত্রের মাঝখানে একটি পরিচিত বাস্তব চরিত্র বারবার এসেছে। সটি 'বাগাল' চরিত্র। বাগাল অর্থাৎ যে গৃহস্থের ঘর থেকে রুর পাল নিয়ে মাঠে যায় চরাতে এবং গোধূলি বেলায় গরু- গুলি ঘরে ঘরে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগের নেক আগে থেকেই 'রাখোয়াল' কৃষ্ণের বাঁশি বাংলা পদ-সাহিত্যে শানা গেছে এবং রাধিকার মন আকুল হয়েছে। তবু তুষু সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের কথাই বারবার মনে পড়ে, কারণ াকৃষ্ণকীর্তন বাঁকুড়ার পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক বাঁকুড়ার গ্রাম থকেই আবিষ্কৃত।[৫৮] সেই পুঁথিতে সর্বজনপ্রিয় একটি পদ আছে—

> কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
> কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
> আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন।
> বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥

'নান্দের নন্দন'এর বাঁশী শুনে রাধিকা অবশেষে ভেবেছে হত্যাগের কথা, কিন্তু পারে নি—

> পাখি নাহোঁ তার ঠাঁই উড়ী পড়ি জাঁও।
> মেদিনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥

বাঁশির ডাকে ঘর-ছাড়া মন আরও নানা বাধা বিঘ্নের খবর াখে। শাশুড়ী ননদী অথবা আয়ান ঘোষ। ঐ একই বাঁশির রের ডাকে ঘর-ছাড়া মন ঐ একই আকুলতায় আজও কাঁপে

৫৮ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মভূমি ও বাসস্থান ছিল বাঁকুড়া জেলার ছাতনা শহরে, কোন কোন পণ্ডিতের মতে।

এবং একই বেদনা অনুভব করে যখন ঘর ছাড়তে পারে না। তুষু গানে শুনি—

বাগাল যখন বাজায় বাঁশি তখন আমি হেঁসালে।
বেরাই বেরাই মনটা করে হেংলা ভাসুর দুয়ারে।
হে ভাসুর তোর পায়ে পড়ি বড় দিদিক বুল না।
বড় দিদিক বল্লে পরে ঘরে ঝেঁটা রইবে না।

এমনি করে কত দিন ধরে কত শত গৃহবন্দিনী 'রাধিকা' মাঠের মুক্তির ডাক দিয়ে বাজা বাঁশির সুরে ঘর ছাড়তে চেয়েছে কে তার হিসাব রাখে। দেবতাকে আমরা আমাদের গানে এমনি করেই প্রিয় করেছি, প্রিয়কে দেবতা। 'বাগাল' হয়েছে বিশ্ব-ব্যাকুল করা বংশীধারী কৃষ্ণ। এই বাগালের সঙ্গে গৃহিণীদের প্রীতির সম্বন্ধ অনেক দিনের, তাই শুনি—'নদী ধারে গাই বিয়ালো গাইটির নামটি হাসি গো/বাগাল ভাইকে কি দাম দুব সোনায় বাঁধা বাঁশি গো'। শুধু তাই নয়, আরও শুনি—'বাগাল বাগাল করি আমরা বাগাল গেছে অনেক দূর/মনে করে আনবে বাগাল শ্যামকল্লার[৫৭] দুটি ফুল'।

প্রেম বৈধ কি অবৈধ সে প্রশ্ন প্রেমের নয়, সমাজের। নিরপেক্ষ মানুষের নয়, নিন্দুক মানুষের বিচার। বাগালের সঙ্গে অবৈধ প্রেমের সম্বন্ধ কথাটিও কোন কোন গানে ফুটেছে যাঁরা তুষু গানে 'অশ্লীল' উপাদান খুঁজে পান তাঁরা হয়তো অতি শুদ্ধিকামী সমাজপতি বা কৃত্রিম নীতিবাদী রসভোক্তা। কিন্তু মনে রাখতে হবে তুষু গানের মধ্যে নারীমনের বিকাশে বৈধ অবৈধ ঘটিত প্রশ্নটি বড় নয়, এই সব গানের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে একটি জীবন্ত গ্রামচর্যার স্বরূপ, যার অনেকাংশই রসরূপ। শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্ন তুলে তাকে হেয় করা অনুচিত। তার

৫৭ শালুক ফুল।

ফলে বঞ্চিত হতে হবে রসরূপ থেকে। জীবনে সব রইল, কিন্তু সম্মিলিত নারীপুরুষ জীবনের রসরূপ বাদ পড়লো, তার থেকে সর্বনাশা আর কিছু হতে পারে না।

বাঙালী নারীমন কত ছোট ছোট কথায় অমোঘ হয়ে ফুটে উঠেছে তুষু গানে, তার খোঁজ নিলেও আনন্দিত হতে হয়। যথা—

আমার তুষু গৌর বর্ণ ইস্‌কুলেতে পড়াবো,
এক খিলি পান পাঁচ সিকাতে তবু কিনে খাওয়াবো।

অথবা

বাড়ীর নাময় দুধের পুকুর চাদর ছেড়ে সাঁতুরব,
রাজার ছেলের দেখা পেলে সুরগুঞ্জা ফুল পাতাব।

ফর্সা মেয়ের কদর বাঙালী সমাজে কম নয়। ফর্সা মেয়ের মায়ের গর্ব ঐ গানে যেমন ফুটেছে তেমন আর কোথায়। আর দ্বিতীয় গানটির গায়িকা হয়তো দিন-এনে-দিন খায় এমন ঘরের মেয়ে। রাজার ছেলের স্বপ্ন দেখা তো তারই সাজে, আর তুষু-ব্রত অনুষ্ঠানই তো সেই স্বপ্ন বোনার সুযোগ দেয়। এই স্বপ্নেরই একমফের অন্য ভাষায়—'মুকুটিদের বৌ-এর সঙ্গে দধিকাদো পাতাবো' অথবা 'সাত ভায়েদের বৌদের সঙ্গে মালতী ফুল পাতাবো'।

আমরা পূর্বেই বলেছি, তুষু গানে নারীমনের অবারণ প্রকাশ ঘটেছে। সেইজন্য নারীমনের হাসিকান্নার চুনীপান্নার সঙ্গে কিছু ক্রুদ, কিছু বিদ্বেষ, কিছু বিকৃতির বিকাশও ঘটেছে। তুষুকে নিয়েও জমে উঠেছে ঝগড়া করার প্রবৃত্তি। এইটি ভারি বিস্ময়-কর। আমার ঘরে তুষু, তোমার ঘরেও তুষু। সেই একই প্রিয় দেবী, আরাধ্য দেবতা। তবু অন্যের তুষুকে নিন্দা করা হয় কেন, নিন্দা করার প্রবৃত্তি জাগে কি করে, বোঝা যায় না। বুঝতে হলে নারীমনের প্রকৃত পরিচয় জানতে হবে। একটি গানে শুনি—

আমার তুষু মান করেছে ই পাড়ার তামাল তলে,
আনরে সন্দেশ থালে করে, মান ভাঙাই সবাই মিলে।
উয়ার তুষু মান করেছে উপাড়ার তামাল তলে,
আনরে জুমড়া[৬০] হাতে করে ধাসব রে সবাই মিলে।

অন্য জনের তুষুর প্রতি বিদ্বেষ এত বেশী যে তুষু মান করলে জ্বলন্ত কাঠ তার গায়ে ঠেসে ধরবার মতো নিষ্ঠুরতার সুযোগ নেবারও ইচ্ছা জাগে। এই রকম বিদ্বেষের খেলা বহু গানে বহুল ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্বেষের একটা অন্য রকম ছবি-- 'আমার তুষু যখন মুড়ি ভাজে তখন তার সোনার চুড়ি ঝলমল করে, আর ওদের তুষু হ্যাংলা মাগি কাপড় পেতে ভিখ মাগে'। অন্যের তুষুকে বিব্রত করার চরম সব ফন্দির মধ্যে একটি—

এক পোয়াটাক পস্ত কিনে তামলীবাঁধে ছড়াবো,
উয়ার তুষুকে ডেকে এনে পায়রা খোঁটা করাবো।

বাঁকুড়া শহরের কেন্দ্রস্থলে তামলীবাঁধ অর্থাৎ বড় জলাশয়ের এক পাড়ের প্রশস্ত অংশে ও সংলগ্ন খেলার মাঠে পোস্ত ছড়িয়ে দিয়ে তারপর তুষুকে পায়রাখোঁটা করানোর অভিসন্ধির কাছে অন্য সব দুরভিসন্ধি কিছুই নয়। আর একটি নির্মমতম বিদ্বেষের উদাহরণ—

আমার তুষুর লাউ ধরেছে উরুলি ঝুরুলি গো
উয়ার তুষুর নাকটা কেটে বাজাবো মুরলি গো।

বিদ্বেষ ও বিবাদের খবর আমরা অনেক পাবো। কিন্তু এ সবের মধ্যে কি শুধুই বিদ্বেষ? না কি, এরই মধ্যে লুক্কায়িত আছে কৌতুকের প্রস্রবন? দল বেঁধে মেয়েরা যখন এই সব গান গাইতে গাইতে তুষুর খলা মাথায় নিয়ে বিসর্জনের পথে চলে তখন কৌতুককণা ছড়িয়ে পড়ে কখনো চাপা হাসির সঙ্গে কখনো

---

৬০ জ্বলন্ত কাঠ।

উচ্ছলিত সমবেত কলকণ্ঠে। আন্তরিক কৌতুকবোধেই এইসব াহ্যিক বিদ্বেষের পরিণতি। তাই এমনও শোনা যায়—

ও পাড়াতে দেখে এলাম উয়ার তিষু তুঁষ চালে,
আমার তিষু বেঞ্চিয়ে বসে ইংরেজী পুথি পড়ে।

খাঁটি বিদ্বেষ যে নেই তাও নয়। অবশ্য তার সঙ্গে তুষুর বশেষ যোগ নেই। তুষু গান গ্রাম্যনারীর মুখে বাক্ স্বাধীনতার য সুযোগ শক্তি দিয়েছে তারই অবকাশে নানা পরশ্রীকাতরতা প্রকাশ পেয়েছে এই ভাবে—

বেনাদের চালেতে ভাই পাকা কুন্দরী
বেনাদের বউ আসছে অতি সুন্দরী।
অতি লয়, অতি লয়, সব সইতে পারি
নাক তুলে তুলে কথা কয় মা তার জ্বালাতে মরি।

এমনি করে বোষ্টমদের, বাগদীদের, বামুনদের ঘরের সুন্দরী উদের রূপের গরিমা সহ্য না করার বিদ্বেষ গানে গানে প্রকাশ পয়েছে। এই রকম অসাধারণ বিদ্বেষের অভূতপূর্ব প্রকাশ নিচের ানটিতে—

এক ভরি কাঠ দু' ভরি কাঠ, কাঠে আগুন লাগাবো।
যখন আগুন পাগল হবে সীতা কেটে ফেলে দিব।
সীতা গেলে সীতা পাবো, রাম গেলে কোথায় পাবো।
সীতা ছিলেন অশোক বনে, রামকে লিয়ে ঘর যাবো।

কেন এই সর্বনাশা বিদ্বেষ, নারী হয়ে নারীহননের পরিকল্পনা, সীতা গেলে সীতা পাবো রামকে নিয়ে ঘর যাবো'—কেন এই কম অভীপ্সা, তার উত্তর পেতে হলে ঐ সব গ্রামীণ নারীর বকীয় স্বভাবটির সম্পূর্ণ খবর রাখতে হবে।

সভ্যতার ক্রমপ্রসারে অটুট গ্রামীণ মানসিকতা ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে, ভেঙে যাবে, হয়তো সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যাবে। সভ্যতার আক্রমণে 'মহাকাব্য' ধারা যেমন লুপ্ত হয়েছে তেমনি ব্রত কাব্য-গুলিও সরে এসেছে শহর থেকে। অথচ আজও সভ্যতাগর্বী নারীরাও যে ব্রতকাব্য ব্রতকথা ব্রতগান রচনা করেন তার প্রমাণ রাঢ় অঞ্চলে, মল্লভূমে বা মানভূমে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষেরাও যে মুখে মুখে আজও তুষু গান রচনা করে চলেছে তার উদাহরণও কম নয়। রক্ত-প্রবাহের মতো এই সব ব্রতধারা গ্রামীণ মানুষের জীবনধারার সঙ্গে মিশে গেছে—তাই লুপ্ত হবার নয় ব্রতবিশ্বাস ও আচার। আদি রীতি থেকে তা সরে আসতে পারে, বিকৃত হতে পারে, কিন্তু তারই মধ্যে আছে নবায়মান বিকাশের সুস্থ সুযোগ। এই তুষু গানকে সাজানো আসরে পরিবেশন করার উদাহরণ যেমন আমরা দিয়েছি, তেমনি দেখেছি রাঢ় বাংলার কাঠিনৃত্যের মতো তুষু নৃত্যও পরিবেশিত হচ্ছে সাজানো মঞ্চে।[৬১] ভাদু ও ঝুমুরের সঙ্গে তুষু গানও পরিবেশিত হতে দেখা যাচ্ছে আকাশ-বাণী কলকাতার 'জেলা-বেতার' অনুষ্ঠানে।[৬২] যে সুন্দরী মেয়েটির গান শুনে আমরা তুষু গানের সামগ্রিক পরিচয় লাভে উৎসাহী হই সেই মেয়েটিও নিজে তুষু গান রচনা করেন। তাঁর একটি গানের নমুনা—

উঠ উঠ উঠ তুষু ঘুম ভাঙাতে এসেছি।
তোমারই সব সবসংতি তোমায় উঠাতে এসেছি ॥
এতখানি বেলা হল তবু কেন সইউঠনা।
কনকচম্পক শরীর থেকে শীতের ঢাকন খোল না।
গাছের কাঁকে রোদের ঝিলিক ঘাসের আগায় শিশির গো।
কি করে ভাই বর্ণিব সই পৌষ সকালের শোভা গো ॥
অনেক পরিবর্তন হয়েছে তুষু আমাদের এই দেশেতে।
মাটির কুঠি ভেঙে যে ভাই দালান কোঠা উঠেছে ॥
বড় বড় দালান কোঠা আকাশচূড়া ছুঁয়েছে।
তারই তলায় সূয্যি মামা ঢাকা পড়ে গিয়েছে ॥
কোথায় গেল কাশের বন আর ধূ ধূ প্রান্তর মাঠ।
তুষু যেথায় হেসে খেলে বসাতো চাঁদের হাট ॥
আমার তুষু রাজার কন্যা কোথায় তারে রাখবো গো।
সারা শহর করে গম্‌গম্ তিলেক ঠাঁইও নাই যে গো ॥
তাই বলে ভাই কোন ভাবনা রেখ না তুষু মনেতে।
এরোপ্লেন চড়ে চলে যাবো চাঁদবুড়ির ঐ দেশেতে ॥
রকেট চড়ে যাব আমরা মহাকাশ অভিযান।
বড় হরপে কাগজেতে লেখা হবে তুষুর নাম ॥

কেন এখনো এইভাবে তুষু গান বেঁচে রইলো বা তুষু গান রচিত হয়ে চলেছে তার কারণ হয়তো এই যে সভ্যতা বাইরের দিক থেকে মানুষকে যতখানি পরিবর্তিত করেছে, নারীমনের মৌল সত্তা ততখানি পরিবর্তিত হয়নি। লোকসংগীতের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আজকাল ভোট পর্ব' বা ভাষা আন্দোলন চলে পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশে। রীতিতে আধুনিক নয়, উপাদান গ্রহণের গতিতে এই ভাবেই তুষু আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলেছে। চাঁদে রকেট প্রেরণের চমকিত আধুনিকতাও যে তুষু গানে গৃহীত হতে দেরী লাগেনি, তার উদাহরণ তো পূর্ববর্তী গানটিতেই আছে। এমন কি 'শোলে' নামক হিন্দী সিনেমাটি বিষ্ণুপুর সহরে এসেছে 'রূপকথা' সিনেমায়, এই 'শোলে' সিনেমা নিয়ে তুষু গান তৈরী হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে এবং বাউরী পাড়ার বালিকারা সে গান পরম উৎসাহের সঙ্গে গেয়ে শুনিয়েছে পৌষ সংক্রান্তির দু'দিন আগে।

৯ তুষু গানের সুরবৈচিত্র্য ও পরিবেশন রীতি

তুষু গান বৈঠকী গান নয়, যদিও বসে বসে গাওয়া হয়। তুষু দাঁড়া কবিগানও নয়, যদিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এবং চলতে চলতেও এ গান পাওয়া হয়। তুষু গানের পরিবেশন রীতির মধ্যে কোন একক গায়কের প্রাধান্য সাধারণত থাকে না। তুষু গান সমবেত গান। সারা পৌষ মাস ধরে ব্রতিণীরা এক জায়গায় তুষু পেতে তাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে গান গায়, কিন্তু পৌষ সংক্রান্তির দু'এক দিন আগে থেকেই পথে পথে পাড়ায় পাড়ায় চলতে চলতে গান চলে। পৌষ সংক্রান্তির দিন সারা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নেচে কুঁদে আনন্দ করে তুষু গান গাওয়া হয়। ছেলেরা, যুবক এমন কি বৃদ্ধরাও তখন যোগ দান করে গানে গানে উল্লাস প্রকাশ করবার জন্য। বধূ, যুবতী, বৃদ্ধারাও পিছিয়ে থাকে না।

তুষু গান পরিবেশনের বৈশিষ্ট্য সামান্যই। তুষুর চারদিকে গোল হয়ে বসে দুলে দুলে তালে তালে গান করে মেয়েরা। গানের একটি লাইনের পুরো বা অর্ধ অংশ ফিরে ফিরে দুবার করে গাওয়ার রীতি। যেমন—

উঠ উঠ উঠ তুষু। উঠ উঠ উঠ তুষু॥
উঠ্ করাতে এসেছি। উঠ্ করাতে এসেছি॥
তোমারি সব সবসংতি। তোমারি সব সবসংতি॥
তোমায় পুজতে বসেছি। তোমায় পুজতে বসেছি॥

একই সুরে, একই লয়ে, একই তালে ছোট বা বড় গানটির সমস্তটাই গাওয়া হবে।

সুর কমনীয়। লয় মধ্যম। কণ্ঠস্বর ক্ষেপের কারিগরী বিশেষ নেই। একটানা সহজ সুরের আমেজে শুধু গায়িকাদের দেহে

মনেই দোলা লাগে না, শ্রোতাদের দেহে মনেও দোলা লাগে। আর, একটি গান থেকে অন্য গানে যাবার সময় থামা হয় না। থামবার প্রয়োজনও হয় না। যতক্ষণ দম থাকে বা স্মৃতিতে যত গান থাকে সবই পর পর গাওয়া হয়। বিষয়ের বৈচিত্র্য আছে গানে, প্রেমের গান, বেদনার গান, বিদ্বেষের বা বিরহের গান আছে, কিন্তু কোন নাটকীয় পন্থায়, গীতিকা বা অপেরার পন্থায় বা বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনের মতো খণ্ডে খণ্ডে (নৌকা খণ্ড, দান খণ্ড, মান খণ্ড ইত্যাদি) ভাগ করা হয় না। গানের মধ্য থেকেই জেনে নিতে হয় কোন্‌টি জাগরণের, কোন্‌টি পুনরাহবানের, কোন্‌টি সমাপ্তির গান। প্রাণের আবেগে ধীর নদীস্রোতের মতো গান গেয়ে যাওয়াই প্রধান রীতি। আর তুষু গান গাইবার জন্য সারা জেলা জুড়ে কি বিপুল আগ্রহ!

তবে কখনও কোথাও তুষু গানের মধ্যে নাটকীয়তা, উল্লাসের ঢঙ, উত্তর প্রত্যুত্তরের সংলাপধর্মিতাও লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণুপুরের একটি অনুন্নত পাড়ার তুষুর আসরে মেয়েরা গান করছে—হঠাৎ পাশ থেকে একটি বয়স্কা মেয়ে তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে গান ধরলো—

এতগুলো তুষু বললি
আমার মনে লাগলো না।
আমি যদি ফিরে বলি
তোদের মুরাদ রাখবো না।

তুষু ভাসানোর দিন ঘাটে ঘাটে এই রকম উত্তর প্রত্যুত্তরে গানের আসর জমজমাট হয়। কোথাও নাচে গানে অংশ নেয় একদল মেয়ের মুখোমুখী অন্যদল মেয়ে, কোথাও নারী ও পুরুষ। তখন গানের ভাষা, সংযম ও সুরের নিয়ম অতিক্রম করে যায়। এই ধরণের দৃশ্য বিষ্ণুপুরের পোকাবাঁধ বা লালবাঁধ, ডিহর বা পোরকুলের মেলাতেও দেখতে পাওয়া যায়।

ঘরের উঠানে বা দুয়ারে তুষু পেতে গানের মধ্যে কখনও সুরহীন ছড়া উচ্চারণের বৈচিত্র্যও দেখা যায়। বাঁকুড়া শহরে শুনেছি নানা বাড়ীতে যে একের পর এক তুষু সুর করে গাইবার পর সমাপ্তির গানটি, অর্থাৎ আগামী দিনের জন্য তুষু আহ্বানের সময় ছড়ার মত করে গাওয়া হল। গানটি—

আজ থাকো মা নন্দরাণী
আনন্দ হয়ে,
আবার তোমায় পূজবো মোরা—
যা পাই তাই দিয়ে গো—
যা পাই তাই দিয়ে ॥

তুষু গানের সঙ্গে 'সঙ্গত্' করবার জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করার নিয়ম নেই। কেননা এসব গান হিসাবে পরিবেশিত হয় না, তুষু পূজার জন্য নিবেদিত। তবু মেলায় বা তুষু ভাসানোর সময় দেখেছি গানের সঙ্গে বাঁশী, ঢাক, ঢোল, কাড়া নাকাড়া, বেহালা, মাদল, করতাল প্রভৃতি বাজছে। অবশ্য গানকে সাজিয়ে তোলার জন্য নয়, প্রাণের আনন্দে বাজানোর জন্যই বাজছে।

পর পর তুষু গান কি ভাবে একটানা সুরে গাওয়া হয় তা ব্রতচারিণীদের আসরে না এলে বুঝতে পারা যাবে না। কোন্ সুরে গাওয়া হয় তার একটি নমুনা স্বরলিপি দেওয়া হল। মনে করুন তারা গাইছে—

আমার তুষু সিনান্ যাবে/জোড়া ঢাকো বাজিয়ে,
উয়ার তুষু সিনান্ যাবে/ জোড়া কুকুর লেলিয়ে।

আকার মাত্রিক স্বরলিপি

তাল: রবীন্দ্রনাথের ষষ্ঠি তালের মতো

২ । ৪ । ৬ মাত্রায়

গা মা	পা । পা ।	ধা ণা	ধা । পা ।
আ মার্	তু ॰ ষু ॰	সি নান্	যা ॰ বে ॰
ণা ধা	পা ণা ধা পা	গা মা	পা । । ।
জো ড়া	ঢা ॰ কো ॰	বা জি	য়ে ॰ ॰ -
গা মা	পা । পা ।	ধা ণা	ধা । পা ।
উ য়ার্	তু ॰ ষু ॰	সি নান্	যা ॰ বে ॰
ণা ধা	পা ণা ধা পা	গা মা	পা । । ।
জো ড়া	কু ॰ কু র	লে লি	য়ে ॰ ॰ -

সাধারণতঃ এই সুরেই ব্রতচারিণীরা তুষু গান গায়। অবশ্য স্থান বিশেষে সুর ও ছন্দের একটু আধটু রকমফের হয়। কিন্তু তুষু গানে বৈচিত্র্য যে নেই তা নয়। বিষ্ণুপুরের কুলুপুকুর পাড় নামক পাড়া থেকে অন্য সুরের গান শুনেছিলাম। একটি নমুনা। গান—

সরু সরু পান বনালাম/সুপারিতে লাগলো ঘুণ্।
ওগো তুষু সুপারিতে লাগলো ঘুণ।
পিরিত করে ছেড়ে গেল/জ্বলছে লো তুঁষের আগুন।
ওগো তুষু জ্বলছে লো তুঁষের আগুন ॥

আকার মাত্রিক স্বরলিপি

ঝাঁপতাল। ৫ মাত্রিক

গা মা	গা । রা	গা পা	ধা । না
স রু	স ॰ রু	পান ব	না ॰ লাম
র্সা র্রা	র্সা । না	ধনা ধা	পা । ।
সু পা	রি ॰ তে	লাগ্ লো	ঘুন্ ॰ ॰

| গা মা | গা । রা | র্সা র্রা | র্সা । না |
ও গো তু ০ ষু সু পা রি ০ তে

ধনা ধা | পা । । ||
লাগ লো ঘুন্ ০ ০ ||

{ পা পা | ধনা র্সা না | ধা পা | মা গা রা }|
{ পি রিত ক০ ০ রে ছে ড়ে গে ০ ল }|

| ন্া সা | রা পা পা | মা গা | রা । |
| জ্বল্ ছে লো ০ তুঁ ষের আ গুন্ ০ |

পা পা | ধা । না | র্সা র্রা | র্সা । না |
ও গো তু ০ ষু জ্বল্ ছে লো ০ তুঁ |

ধনা ধা | পা । । |
ষের আ গুন্ ০ ০ |

পোরকুলের তুষু মেলাতে যে গান আমরা প্রথমে শুনি তার মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। অবশ্য এখানেও মেয়েরা সাধারণ তুষুর সুরেই গাইছিল। একজন গায়কের নমুনা তুলে দিচ্ছি। গানটি—

কি রঙ উঠেছে কলিতে
যুবা বৃদ্ধা কি বা নারী মজেছে ভাই চায়েতে।
চায়ের নেশা এমনি নেশা ভুলে যে যায় মুখ ধুতে ।।
কি রঙ উঠেছে কলিতে।

আকার মাত্রিক স্বরলিপি
তাল—দাদরা

|মা । মা | । গা । | রা সা । | ধ্া ন্া ।
কি ০ র ঙ উ ০ ঠে ছে ক লি ০

| সা । । | । । । | মা মা । | মা । মা
| তে ০ ০ ০ ০ ০ যু বা ০ বৃ দ্ ধা

মা মা ।	গা মা ।	পা । ধা	পা মা ।
কি বা ০	না রী	ম ০ জে	ছে ভা ই

পা । মা	গা । ।	সা সা ।	র্রা জ্ঞা ।
চা ০ য়ে	তে ০ ০	চা য়ে র	নে শা ০

র্রা সা সা	ণ্া ণ্া ।	পা ধা ।	পা মা ।
এ ম্ নি	নে শা ০	ভু লে ০	যে যা য়

পা । মা	গা । । ‖
মু খ্ খু	তে ০ ০ ‖

১০. কিছু সংশয়, কয়েকটি সমাধান

টুসু গান, ব্রত ও আচার উৎসবের আলোচনার শেষে কয়েকটি প্রশ্ন ও কিছু সংশয়ের উপর পুনরায় আলোকপাত করা যেতে পারে। কোন কোন পণ্ডিত প্রশ্ন তুলেছেন, টুসু প্রকৃতপক্ষে কোন দেবতা তা সুনির্ধারিত হয়েছে কি? তাঁদের প্রশ্ন, টুসু যদি শস্যদেবী বা উৎপাদনের দেবী তাহলে টুসু গানের অজস্রতার মধ্যে শস্য উৎপাদনের কথা এত কম কেন? একথা ঠিক যে টুসু গানে তুলনামূলক ভাবে শস্য উৎপাদনের কথা অনেক কম, কিন্তু একেবারে যে নেই তা নয়। কামনা-বাসনা মূলক টুসু গানে 'ধনধান্যে হুলথুল' হয়ে ওঠার কথা বার বার এসেছে। তাছাড়া পূজাবিধির মধ্যে তুষ, গোবরগুলি, দুর্বা প্রভৃতি ব্যবহার দেখেও বলা যায় উর্বরতার নির্দেশটি এ সবের মধ্যে রয়েছে। পোরকুলের মেলায় আমরা শুনেছিলাম, ৫০/৬০ বছর আগে ঐ অঞ্চলে মাটিতে গর্ত করে তাতে ফুল দিয়ে টুসু পূজা করা হত। পুরুলিয়ার গ্রামে এখনও কোন কোন বাড়ীতে তুলসীতলায় মাটি কেটে গর্ত করে তাতে টুসু পূজা হয়। এই উক্তি ও নির্দেশের অনুসরণে টুসুকে শস্যদেবী বা উৎপাদনের দেবীরূপে স্বীকার করে নিতে কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না। হুগলী জেলার মতো রাঢ় অঞ্চলেও ইতু সরায় টুসু তোলার প্রথা আছে স্থান বিশেষে এবং বিশ্বাস আছে যে ইতুর বোন টুসু। ইতু (অর্থাৎ মিতু) অর্থাৎ সূর্য আর টুসুর যোগ সূর্যদেবতার সঙ্গে শস্যদেবীর যোগ সহজবোধ্য। সূর্য দেবতাদের কামিন্যার মধ্যে টুসুও একটি। টুসু ভাসানোর পর স্নান করে সকালের সূর্য দর্শনের রীতির মধ্যেও ঐ একই বক্তব্য। অন্য দিকে—'জলে হেলা জলে ফেলা জলে তোমার কে আছে / অন্তরে ভাবিয়া দেখ জলে শশুর ঘর আছে।'—গানে গাঁথা এই উক্তির মধ্যেও জলের সঙ্গে শস্যের সম্বন্ধটিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই সূত্র ধরে টুসুকে বাণিজ্যলক্ষ্মী বলতে চেয়েছেন কেউ কেউ।

শস্যদেবীর বাণিজ্যযাত্রা বলতেও অসুবিধা নেই। কারণ 'তোষলা' বা 'তুষলা' শব্দটিকে ভেঙে তুষুর 'লা' (নৌকা) অর্থাৎ তুষুর নৌকা করে নেওয়াও কঠিন নয়। পৌষ সংক্রান্তিতে তুষুর 'ভেলা' ভাসানোর নিয়মটিও তো সেই কারণে। কিন্তু নিশ্চিত উত্তর পাইনি এই প্রশ্নের যে তুষু গানে শিবের আবির্ভাব কেন বারবার ঘটেছে ? এই শিব যদি অনার্য দেবতা হন তাহলে তিনি কৃষিজীবী এবং শস্যক্ষেত্রে তার দেখা পাওয়া আশ্চর্য নয়। যাই হোক, তুষু পৌরাণিক দেবী নয় বলে, শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত দেবী নয় বলে, তার অবয়ব অস্তিত্বের মধ্যে নানা প্রভাবের মিশ্রণ ঘটেছে। সব মিলিয়ে তুষু যে লক্ষ্মী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বয়স ও স্থান নির্বিশেষে সব ব্রতচারিণীদেরই বিশ্বাস এই যে তুষু হলো 'লক্ষ্মী'।

তুষু সরা, তুষু ঘট, তুষ খলা থেকে তুষুমূর্তি কি ভাবে এসেছে তার উত্তর দিতে গিয়ে পণ্ডিতেরা ভাদু মূর্তির প্রভাবের কথা বলেছেন। ভাদু মূর্তির প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু অন্য একটি দিকও বিবেচনা করার আছে। তুষুর সরা, ঘট বা খলা ভাবকেন্দ্রিক প্রতীক মাত্র অথবা ভাবপ্রকাশের সহায়ক উপকরণ মাত্র। সাধারণ মানুষ ভাব ও প্রতীকের মধ্যে বেশী দিন আকৃষ্ট থাকতে পারে না। ভাব তাই মূর্তিতে রূপ লাভের সুযোগ চায়। তাকেই পৌত্তলিকতার আদি সূত্রকারণ বলা হয়। ধীরে ধীরে তুষু মূর্তি নির্মাণের আগ্রহ ও দক্ষিণ বাঁকুড়ায় অজস্র তুষুমূর্তির ব্যবহার একটি ব্রত-আচারের ভাব জগৎকে মূর্তিময় করে তোলারই আন্তরিক চেষ্টার নিদর্শন।[৬৩] অচিরকাল পরেই

৬৩ অবশ্য পোরকুল অঞ্চলে তুষুমূর্তি প্রচলনের পিছনে একটি কিংবদন্তী ও আছে—"প্রাচীনদের মুখে শোনা পর পর দু'বছর পরকুল দহে স্নান করবার সময় দুটি ছোট মেয়ে ডুবে মারা যায়। এতে অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, প্রতি বছর একটি মেয়ে এই পরকুল দহে অবশ্যই ডুবে যাবে। এই সংস্কারের বশবর্তী হয়ে কিছু সম্প্রদায়ের মায়েরা একটি করে মাটির তৈরী পুতুলকে কন্যা কল্পনা করে পরকুল দহে নিয়ে যেত এবং স্নানের পর দহে ডুবিয়ে দিত। কালক্রমে এই মাটির পুতুলই নাকি টুসু নামে পরিচিত হয়েছে।" [পরকুল মেলায় টুসু, তুলসীচরণ মণ্ডল, মুকুর, ৩য় সংখ্যা, খাতড়া, বাঁকুড়া, ১৯৭৬।]

হয়তো দেখা যাবে তুষুমূর্তি সর্বত্র পূজিত হচ্ছে, মনসা বা সরস্বতী মূর্তির মতো।[৬৪] তুষুকে ময়ূরবাহনা করে আমরা তো তাকে পৌরাণিক দেব-দেবীর পর্যায়ে ইতিমধ্যেই তুলে দিয়েছি।

তুষু খলা সম্বন্ধেও পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তের উপর সন্দেহ জাগে। ছোট বা বড় তুষু খলা দেখতে ভারি সুন্দর। একটি সরার বাড়ের উপর প্রদীপ, মাটির ছোট ছোট প্রদীপ, গোল করে বসিয়ে তুষু খলা তৈরী হয়। এই ভাবে সাজানো প্রদীপের সংখ্যা কোথাও ৭ কোথাও ১১, কোথাও বা তার বেশী। প্রদীপের সংখ্যা বেশী হয়, খলাটি যখন খুব বড় হয় অথবা একতলা বা ছু'তলা বা তিন তলা হয়। প্রতি তলে গোল করে প্রদীপ বসানো থাকে। প্রদীপ সংখ্যার যে কোন বাঁধা নিয়ম আছে তা মনে হয় না। অথচ জনৈক পণ্ডিত বলেছেন, তুষুর খলায় ১৪+১=১৫ টি প্রদীপ থাকে এবং এর মধ্যে পুষ্করণা অধিপতি চন্দ্রবর্মার শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপির অন্তর্গত প্রতীক চিত্রটির প্রভাব আছে। যে প্রতীক চিত্রে ১৪+১=১৫টি দীপ শিখা সমম্বিত পনেরটি দীপের চক্রাকার চিত্র আছে। এটিকে তিথি গণনার নিদর্শনও বলা হয়েছে। কিন্তু তুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা কোথাও শুধু ১৫টি প্রদীপ সমম্বিত তুষুখলা দেখতে পাইনি। তুষু গানের মধ্যে 'পোখন্না' [অর্থাৎ পুষ্করণার] উল্লেখ আছে, কিন্তু চন্দ্রবর্মার উল্লেখ কখনও পাইনি। কেউ কেউ বলেন পঞ্চদশ প্রদীপের তুষুখলার প্রচলন এককালে না কি শুশুনিয়া পাহাড় অঞ্চলে ছিল।[৬৫]

তুষু গানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও প্রশ্ন জাগে। প্রায় সমস্ত তুষু

৬৪ গ্রন্থ প্রকাশ কালে খবর পাওয়া গেল হুগলী জেলার কাঁনানদী অঞ্চলে তুষু মূর্তির প্রচলন হয়েছে। অর্থাৎ মূর্তির দিকেই ব্রত-মানসিকতা অগ্রসর হচ্ছে।

৬৫ অবশ্য পঞ্চদশ প্রদীপ সমম্বিত একটি তুষু মূর্তি আমরা পুরুলিয়ায় দেখেছি।

সমালোচকই বলেছেন—তুষু ব্রত, আচার অনুষ্ঠান ও গান ভারতবর্ষে আর্য-সংস্কৃতির আধিপত্যের আগে থেকেই চলে আসছে। বাংলার অন্যান্য বারব্রতের মতোই তুষুব্রতের প্রাচীনত্ব সর্বস্বীকৃত। কিন্তু প্রশ্ন জাগে কোন্ গানগুলি প্রাচীন? প্রাচীন গানগুলির স্বতন্ত্র পরিচয় কি? পোখর্ণা, নীলচাষ, বাণিজ্য যাত্রা প্রভৃতি বিষয় উল্লিখিত হলেই গান প্রাচীন হয় না। আর তুষু গানের কোন পাণ্ডুলিপি নেই, আবিষ্কৃত হয়নি কোন পুঁথিপত্র। মুখে মুখে গানের ভাষা (যদিও ধরে নেওয়া যায় যে প্রাচীন আছে) আধুনিক হয়ে উঠেছে। অতএব তুষু গান যে কত প্রাচীন, কোন্ গানের আয়ু কত দিনের, নির্ধারণ করার কোন উপায় আছে কি? কোন প্রাচীন গ্রন্থে, পুঁথিতে, শিলালিপিতে তুষুর উল্লেখ আছে কি? এ সম্বন্ধেও অন্বেষণ করার দরকার।

তুষু গানের বিষয় গ্রহণের পরিধি সম্বন্ধেও প্রশ্ন জাগে। তুষু গানে সামাজিক ও পাবিবারিক বিষয় অনেক আছে। পৌরাণিক বিষয়ও আছে। কিন্তু ঐতিহাসিক বিষয় তেমন নেই বললেই চলে। শুধু বিষ্ণুপুরে অনেকের মুখে মদনমোহনের মূর্তি চুরির ও দলমাদল কামান নিয়ে যুদ্ধের বৃত্তান্ত ঘটিত গান শুনতে পেয়েছি। সেটিকে পৌরাণিক বিষয় বলাই ভালো। জানি না তুষু গানে ইতিহাস এমন উপেক্ষিত কেন?

শুদ্ধাচারের প্রশ্নটিও তোলা যায়। তুষু ব্রত ও শুদ্ধাচারের সীমা খুব মজবুত নয়। কোন মন্দিরে বা স্পর্শাতীত পীঠস্থানে তুষু পাতা হয় না। কোন কোন পরিবারে শুদ্ধ স্থানে তুষু রাখা হলেও আমরা দেখেছি ছোট ছোট মেয়েরা তুষুর সরা বা ঘট বা ডালা হাতে এখানে ওখানে ছুটোছুটি করছে। তাদের সাজসজ্জা খাওয়া দাওয়া আমোদ আহ্লাদের মতোই তুষু পূজা নিত্য জীবন যাপনের অঙ্গ যেন। তাই বুঝি তুষুকে 'মুলা মুড়ি' দিয়ে পূজা করাও যায়। হয়তো শুদ্ধতার গণ্ডী নেই বলেই তুষু শ্লীলতার গণ্ডী অতিক্রম করে অশ্লীলতাকেও প্রশ্রয় দেয়। ব্রাহ্মণবাড়ীর

কুমারী বালিকা তুষু পূজা করছে—সেখান থেকে অনেক দূ
বারাঙ্গনা পল্লীতেও তুষুর উৎসব চলছে। বারাঙ্গনা পল্লীর তু
গান শুনে মনে হয়েছে এখানে 'লাজ লজ্জা সরম সজ্জা' যেম
আছে, তেমনি সব লজ্জার দোপাট্টা তুলে দিয়ে 'চুয়াড়ী' আ
আছে 'হারাহারি'র গান, 'নেংটানেংটি'র গান। সাদা চোখে এস
গান হয় না। সন্ধ্যা নামে, রাত গভীর হয়, নেশা জমে ও
তারই সঙ্গে গান শ্লীলতার গণ্ডী ছেড়ে অশ্লীল ভাষা বিন্যাসের দি
যায়। কুটিল ভালোবাসা, অবৈধ প্রণয়, যৌনাবেদন, দৈহি
মিলন, নারীর সন্দেহ ও শোক দুঃখ, পুরুষের কাপুরুষতা, তী
চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যময়ী নারীর বীরদাপ,. দেহজ কামনার শা
প্রভৃতি বিষয়ে গীত গানের মধ্যে তুষুর উল্লেখ বারবার থা
থাকে প্রতি পদে (যেমন থাকে বারাঙ্গনা পল্লীর ভাদু গানে
কিন্তু এগুলিকে তুষু গান বলা যায় কি? শুদ্ধমনা কুমা
মেয়ের তুষুগানের সম্পদই প্রকৃত তুষুগানের পরিচয় বহন কর
বারাঙ্গনা পল্লীর তুষু গান নয়। কারণ সেখানে ব্রতচারিণী কুমা
কোথায়? যদিও চিরাচরিত প্রথায় সার্বজনীন গানগুলিও বারাঙ্গ
পল্লীর মেয়েদেরও গাইতে শুনেছি এবং সংযত মানসিকতা দেখেছি
তাই মন্তব্য করতে হয়, এখানেও শ্লীল-অশ্লীলতার প্রশ্ন নয়,
গানের উপাদানগ্রহণী ক্ষমতাকেই প্রমাণ করে। আর এ
কথা মনে রাখতে হবে, উৎপাদনের দেবী তুষু মূলতঃ দু ধর
উৎপাদনের দেবী। প্রথমতঃ শস্য উৎপাদন, দ্বিতীয়তঃ সন্ত
উৎপাদন। অতীতে fertility cult একাধারে মৃত্তিকাকে
দৃষ্টিতে দেখতো সেই দৃষ্টিতে নারীকেও দেখতো। একদিকে মা
অন্যদিকে মাতা—দুই ই এক সূত্রে বাঁধা. যার, একদিকে কা
অন্য দিকে কাম। তাই তুষু গানে কখনও যৌনতা দেখতে পে
তাকে নিন্দা করা ভুল।

পরিশিষ্ট

ভুষু গানের সংকলন

[এই সংকলনের কোন গানই অন্য কোন গ্রন্থ বা পত্র পত্রিকা থেকে নেওয়া হয়নি। সবই বাঁকুড়া জেলার ব্রতচারিণীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা। অনেক সময় তাদের বলে দেওয়া, বানান ব্যবহার করা হয়েছে. তাই বানানের বৈচিত্র্য দেখা যায়। গানগুলির মধ্যে কয়েকটি আমাদের আলোচিত প্রবন্ধের মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।]

১

আমার তুষু সিনানে গেছে কালীদহের পুকুরে।
কোথাকার এক ব্রাহ্মণ এসে শঙ্খ পরায় তুষুরে॥
শঙ্খ যে পরলি মাগো মূল্য নিব কার কাছে।
ঘরে আছে অবৈ [১] দেবরাজ মূল্য লাওগা তার কাছে॥
ওহে ওহে অবৈ দেবরাজ মূল্য দাও হে আমারে।
তোমার কন্যা শঙ্খ পরিল কালীদহের পুকুরে॥
শঙ্খ যে পরলি মাগো হাতে কেমন সেজেছে।
দশ হাত বাড়িয়ে মাতা অবৈকে দেখা দিয়েছে॥

২

বাড়ির লাম নারকেল গাছটি বারে বারে জল দিব।
একটি নারকেল চুরি গেলে ডাকে চিঠি পাঠাব॥
চিঠি পাঠাই খবর পাঠাই তবু জামাই আসে না।
জামাই আদর বড় আদর তিন দিন বই থাকে না॥
আর তিন দিন থাক জামাই খেতে দিব পাকা পান।
বসতে দিব শীতলপাটি, তুষু মাকে করব দান॥
দান করতে দান করতে চোখে পড়ল রো।
আন বিটি লাল গামছা চোখের পুছাই রো। [২] লো
চোখের পুছাই রো॥

৩

চল তুষু চল খেলতে যাব রানীগঞ্জের শহরে।
ঐ পথে চল দেখে আসব কয়লা খাদের মহরে [৩]॥
কয়লা খাদের ময়লাবাবু সে করে তুষু পূজা।
সন্ধ্যা হলে শীতল লাউ মা কলিকাতার ফুল বাতাসা॥

৪

আমার তুষুর একটি ছেলে গায়ে বর্ণ ফিরে না।
কোন্ বিড়ালী ধুলা দিলি গায়ের রঙ তো ফিরে না॥

১ অভয়। ২ অশ্রুজল। ৩ মহলে (?)।

৫

উপরে পাটী নীচে পাটী তার ভিতরে দারোগা।
ও দারোগা পথ ছাড়গা তুষু যাবে কলিকাতা॥

৬

এতদিন রাখলাম তুষুকে মা বলতে পারলাম না।
যাবার সময় বায়না ধরল মা ছাড়াত যাব না।
তুষু আমার মাগো আলতা পরা পা গো,
জামাই আনতে যাগো,
জামাই আনা অমনি নয় মা দুশো টাকার খরচ গো।

৭

আম বাগানে বাজল ঢাকি আসছে না কি তুষু ধন।
দেখ গো বিন্দে দেখ গো বিন্দে কেমন সাজের সিংহাসন
বিংড়ে [৪] যাবো পোদ্দার আনব গড়িয়ে দিব সিংহাসন।
তাতে বসে খেলা করবে রাজকুমারী তুষু ধন॥

৮

তুষু আমার মান করেচে, মানে গেল সারারাত।
মানের কপাট খুলো তুষু দাঁড়িয়ে আছে প্রাণনাথ॥

৯

চল তুষু চল খেলতে যাব কুলীতে বান বাঁধাব।
কুলীর[৫] জলে স্নান করে ঝরোকায় [৬] চুল শুখাব॥
আটচালা চণ্ডীমেলা বাসকফুলের বিছানা।
ঝিৰি কেটে জল ঢুকল ভিজল তুষুর বিছানা॥

১০

ওমা আমি ফুল পাতাব ফুলকে আমি কি দুব।
বাজার যাব পয়সা দুব ফুলকে ফুলম তেল দুব॥

---

[৪] গ্রামের নাম (?)। [৫] গ্রাম্য পাড়ার রাস্তা। [৬] জানা

১১

বাঁকুড়াতে দেখে এলম ব্যাঙে করে কেছারী।
সাপ দেখে ব্যাঙ পালিয়ে গেল পড়ে রইল কেছারী ॥

১২

আম ধরে থোপা থোপা তেঁতুল ধরে বাঁকাগো
ই কখনো শুনি নাই মা নাড়ের[৭] হাতে শাঁখা গো।
নাড়ের শাঁখা কাঁকাল বাঁকা কলসী নিয়ে জলকে যায়
পাড়া পড়সী টিটকারী দেয়, বলে সবাই হায়রে হায় ॥

১৩

যাব আমরা একেশ্বরে
ভক্তি ভরে পূজিব মহেশ্বরে
বসব গিয়ে মন্দিরেতে
চল যাব সব সতী গো
ভক্তি ভয় দিব তারে
যাব আমরা সকলে
পূজব গিয়ে বিল্বিদলে ॥

১৪

ই-চালে উ-চালে পুঁই, খাব পুঁইয়ের মেচুড়ী[৮]।
রাত দুপুরে খপর এল মরেচে তুষুর শাশুড়ী ॥
শাশুড়ী মল ভালই হল আর তুষুকে পাঠাব না।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া করবো জামাই বলে মানব না ॥*

৭ বিধবা। ৮ পুঁই দানা।

* এই গানটির অন্য একটি পাঠ : 'ই চালে পুঁই···মেচুড়ি,/আর যাব না শশুর বাড়ী ধরে মারবেক শাশুড়ী।/ও শাশুড়ী গাল দিও না পাশা খেলতে গেছি।/পাশা খেলা যেমন তেমন তেমনি খেলন খেলেছি।'

১৫

আগে যায়রে ভার বাউটী[১] পিছু যায়রে ডুলি।
দাঁড়ারে ভারীরে মায়ে বোধ করি ॥
মা বড় নির্ব্বুদ্ধি কেঁদে কেঁদে মর।
আপনি বুঝিয়া দেখ কার ঘর কর ॥*

১৬

এ চালে ধান ও চালে ধান সকল খেল হাঁসে গো।
আমার তুষু নাক বিঁধালো গাঁদা ফুলের বাসে গো ॥

১৭

এতদিন রাখলাম তুষু কুঁঠীর কপাট দিয়ে গো।
আর তুষুকে রাখতে নারলাম মকর আইচে নিতে গো
এস মকর, বস মকর, দাঁড়াও মকর গাছতলে।
তুটি চরণ ধুইই দিব নয়নেরই জলে গো ॥

১৮

কুলে-খাড়া ফুল তুলতে গেলাম জটাই লটাই পাতা।
শিব চরণে দেখা হল শিবের মাথায় জটা ॥

১৯

উঠ উঠ উঠ তুষু উট করাতে এসেছি।**
তোমার সব সখীগুলি তুষু পুজতে বসেছি ॥
পুজারীরা পুজা করে তুষুর মনে লাগে না।
আচীরে পাচীরে পদ্ম নীলপদ্ম বই ফুটে না ॥

১ ভার বহনকারী।

* রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত 'ছেলে ভুলানো ছড়া'তেও ঠিক এই কথা আছে।

** এই গানটি নানা স্থান থেকে বারবার পেয়েছি, একটু ভিন্ন পাঠে। যেমন—

উঠ উঠ উঠ তুষু, উঠ করাতেই এসেছি.
তোমারি সব সখিগুলি চরণতলায় বসেছি।
চাঁদকে যেমন তারায় ঘিরে, তেমনি ঘেরণ ঘিরেছি ॥

ভ্রমর এল খাতা খাতা,[১০] রসিক দেখে ফুল পাতা।
এমন দেখে ফুল পাতাবি সঙ্গে যাবে কলকাতা॥
কল্‌কাতারই ঝুরা নিশি,[১১] বর্ধমানের হর়তকি।
কোন্ হর্‌তকি লিবেন তুষু, খুল গলার চাঁদমালা॥

২০

নদী ধারে গাই বিয়াল গাইটির নামটি 'হাসি' গো।**
বাগাল[১২] ভাইকে কি দাম দুব সোনাই বাঁধা বাঁশি গো॥
বাগাল যখন বাজায় বাঁশি তখন আমি হেঁসালে।
বেরাই বেরাই মনটা করে হেংলা ভাসুর দুয়ারে॥
হে ভাসুর তোর পায়ে পড়ি বড় দিদিক বুল না।
বড় দিদিক বল্লে পরে ঘরে ঝেঁটা রইবে না॥
ঝেঁটালম্ পেটালম ধূলা তবু ধূলার গাদি গো।
সে গাদনে গেদে দোব ডালিমের ও ডাল গো॥
ধরল ডালিম পাঁকল ডালিম চোরে নিল ডাল ভেঙে।
চোরের মাথায় বাঁকা সিতা 'অলি'কে নিয়ে পালাল॥
'অলি' আমার আল্‌হাদিনী গাঁটে বাঁধা আধুলি।
কাল সকালে খুলে দেখব তিনটি সোনার মাদুলী॥
কোন্ মাদুলী লিবেন তুষু, খুল গলার চাঁদমালা॥

২১

নদী ধারে নাইকল[১৩] গাছটি দিনো রাতো সাজাবো।
একটি নাইকল চুরি গেলে—ডাকে চিঠি পাঠাবো॥
চিঠি পাঠাই পত্র পাঠাই, তবু জামাই এল না।

---

১০ দলে দলে। ১১ নিশাদল, এখানে 'মিশি' ও বলে, দাঁতে দেয়।
** রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত ছেলে ভুলানো ছড়াতেও আছে 'গাইয়ের নাম হাসি'।
১২ রাখাল। ১৩ নারিকেল।

জামাই আদর বড়ই আদর তিন দিন বই রইল না॥
আর তিন দিন থাক জামাই খেতে দিব পাকা পান।
বসতে দিব ঠেস মাচুলী, শুতে দিব পালংক।
এ পাংলক কে গড়েছে উ মা ছুতার মিশ্‌তিরী।
আলো চালের কাল পিঠা ঝাঁটি[14] জ্বালেও সিজল[15] না।
জামাই করে আনাগোনা বিটি পাঠা হবে না।
বাপে বলে দে গো পাটঠে মায়ে বলে হবে না॥
ভায়ে বলে শিশু বোনটি কাঁদিয়ে পাঠাবো না।*

২২

জয়ক সীতা মুষ্টি ভিক্ষা জয়ক সীতা নন্দিনী।
পুষ্প রথে চাপেন সীতা ভাবেন গো মনে মনে॥
কার জন্যে বাপ বিচন সীতাআমি আনবো রামের নাম॥
রামকে চাঁদর, রামকে বাঁদর, রামকে দাও মা বনবাস।
রামের কষ্টিই লিখা আছে, চৌদ্দ বছর বনবাস।
রাম যদি ভাই যাবি বনে ফিরে দাঁড়াই এগণাতে।[16]
যতগুলি মনের কথা বলে যাও সাক্ষাতে॥

২৩

একশ' টাকার মাদল পাঁকা, কোন বাজারে নামাব।
আয় গো পিসি, আয় গো মাসী, একটা ভেঙে জল খাবো।

২৪

একশ' টাকা লিলি কাকা দিলিরে বুড়া বরে।
বুড়ার সঙ্গে চলতে গেলে রানীগঞ্জের শহরে॥

---

১৪ এক ধরণের গাছ, জালানি কাজে লাগে। ১৫ সিদ্ধ হল।

* 'আলো চালের কালো পিঠা' গানটি স্বতন্ত্র গান হিসাবে অন্যত্র পেয়েছি। তার শেষ অংশে আছে—

'বাপ যদি হে রাখতে যাবে সরু চাদর গায় দিয়ে,
ভাই যদি হে আনতে যাবে ইংরাজী জুতা পরে'।

১৬ আঙিনা।

রানীগঞ্জের লোকে বলে ওটি তোমার কে বটে।
লাজ লজ্জা সরম সজ্জা—ঠাকুরদাদা হয় বটে।

২৫

নাম বাড়ী দুধের পুকুর চাদর ফেলে সাঁতরাবো।
মুকুটিদের বৌ এর সঙ্গে দধিকাদো পাতাবো॥

২৬

এ চালে পুঁই ঐ চালে পুঁই খাব পুঁয়ের মেচুড়ী।
খেতে খেতে খবর এল, মইচে তুষুর শাশুড়ী॥
মরুগ মরুগ আরো মরুগ চন্দন কাঠে পুড়াবো॥
চন্দন কাঠে পুড়ি পরে অম্বিকানন ঘর যাবো॥
অম্বিকানন ঘরে মাগো সবাই পরে নীল শাড়ী।
আমি মা তোর কোলের ছেলে—
আমাকে পরালি নি মা নীলশাড়ী॥

২৭

বাঁকুড়াতে দেখে এলম কাড়া[১৭] লড়াই লেগেছে।
দু'ধারে দুই মুণ্ডু পড়ে রক্তেতে বান ছুটেছে।
কাড়া লড়াই ভীষণ লড়াই দেখে আমার ভয় লাগে।

২৮

আয়রে নাপিত্ত বসরে ঘাটে দেরে তুষুর থর কেটে।
এমন দেখে থর কাটবি মানকানালী ছোকরেখে[১৮]।
মানকানালী ছোকের কুলি ছোক বিলায় কুলি কুলি।
বামুন কুলি নোংরা কুলি লোকে ফেলে থোঁতকুড়ি।
আমাদেরি কুলি যাবে গালে গালে পান খিলি।

১৭ মহিষ (পুং)। ১৮ মান্‌কানালী গ্রামের মত বিশেষ সাজ (Decoration).

২৯

চার কোনিয়া চার পুকুর ধারে লগম্[১৯] লতায় ঘিরেছে
কোন বামুনের ছেলে এসে ডাল ভাঙে ফুল তুলেছে।
ডাল ভাংলি বেশ করলি তাতে করব খনজরি[২০]।
সে খনজরি হাতে লিয়ে হব কুলির ভিখারী।
ভিক্ষা দাও মা নন্দরানী, আমি ভিক্ষার কি জানি॥

৩০

বাঁকুড়াতে দেখে এলম গেলাসে ফুধ ফুটেছে।
সাহেব বলে পালা পালা আমার কপাল ফেটেছে।
আনরে ছুরি কপাল ফারি বিধিতে কি লেখেছে।
আড়াই কলম লেখে লক্ষ্মণ চৌদ্দ বছর বনবাস।
রাম বসেছে চুপিসারে আমারই কি অধিকার।
রাম যাচ্ছেন লাল টুপি পরে, সঙ্গে দুটি লোক দুব।

৩১

টুসুর লেগে রাস্তা দিলম, রাস্তা মনে লাগল না,
পেছু দিকে চেয়ে দেখ ভদ্দর লোক বৈ চলে না।
টুসুর লেগে বাগান দিলম, বাগান মনে লাগল না
পেছু দিকে চেয়ে দেখ, আম ধরেছে থকা থকা।
তেঁতুল ধরে বাঁকা গো—
এমন শুনি নাই মা নাড়ের হাতে শাঁখা গো॥

৩২

পোষ মাসে টুসু তুলল্যাম, চন্দন কাঠের চৌদল্লা।
একা মন্দির দুয়া মন্দির তিনা মন্দির ঠেকেছে,
এত বড় গাঁয়ের রাজা দালান দিতে লেরেছে।
ধবজার উপর চেপে দেখব কাশীপুরের রাজাকে।

১৯ লবঙ্গ। ২০ খঞ্জনী, বাদ্যযন্ত্র।

কাশীপুরের বাসি চাদর রাখবি মা যতন করে।
কাল সকালে চলে যাব কাঁদবি মা বিনয় করে॥

৩৩

বাঁকুড়াতে দেখে এলম দালানে খড়ি মাটি।
কোন দালানে বাজল বাঁশি মন হল শুনে আসি॥

৩৪

আয়না আনতে বায়না দিলম তবু আয়না এল না।
দাঁতে মিশি, চোখে কাজল, মুখ দেখিতে পেলম না॥
আট চালাতে চণ্ডীমেলা বাসক ফুলের বিছানা।
পাশ ঘুরে শুওনা টুসু ভেঙে যাবে গহনা॥

৩৫

সখের ঘটী, সখের বাটি, সখের দিইছি আলপনা,
দেখরে টুসু সখ রেখেছি মেড়ের[২১] উপর কারখানা।
উপর কঠায় উঠল্যাম টুসু সরু দেখে ছচ্[২২] দিবে
নামবার বেলায় নেমে এসে শিবের মাথায় ফুল দিবে।
মুটুক ভেঙে ফুল পড়িল দে লো বাঁজির আঁচলে,
সবাই ব্যলল খোকা হবেক নাই গো বাঁজির কপালে।

৩৬

আখ বাড়ীতে ঢাক বাজিল আসছে আমার টুসু ধন।
ছ্যাখ দেখিরে ব্রজের বালক কত দূরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনের বিন্দে তুমি নামটি তোমার মহেশ্বর
বৃন্দাবনকে শূন্য করে আইচ তুমি আমার ঘর।

৩৭

এস এস রামকুমারা টুসু গ্যাছে কন বনে,

২১ দেব প্রতিমার কাঠামো। ২২ লাতা, নাতা, ঘর মোছা বা গোবর গোলা জল দিয়ে নিকোনো হয়।

টুসুর পায়ে সোনার নূপুর বাজছেরে অশোক বনে।
অশোক বনের পাতের ক্যাড়ায় সীতা পাশা খেলেছে
যোগীর বেশে রাবণ এসে সীতা হরণ করেছে।
সীতা হরণ করলে রাবণ সীতা রাখবে যতনে,
মিনি সুতার মালা গেঁথে দুব সীতার চরণে।

৩৮

জিরগুণ্ডা ফুল থপা থপা হলুদ বলে বেটেছি,
ও শাশুড়ী গাল দিও না পাশা খেলতে বসেছি,
পাশা খেলা যেমন তেমন জ্যুট খেলাতে হেরেছি।

৩৯

ওহে ওহে খোকার বাবা আজ যে ঘরে টুসু
তাও মনে কি পড়ে না
রাত বারটা বেজে গেল শীতল এনে দিলে না।
খুল খুল স্যুটকেশ খুল বের করে নাও ব্যাগখানা
সারকেল লিয়ে যাও বাজারে বিলম্ব আর ক্যর না।
বেছে বেছে কিনবে সন্দেশ ঝিলাপি মিহিদানা,
কেঞ্জ্যাকুড়ার ছুথু দত্ত মন্দ জিনিষ করে না,
তার দকানে লিবে সন্দেশ বাজে দকান যেয় না।

৪০

তুষ তুষলা কান তুষলা তুষলা গো রাই
তোমার দৌলতে আমরা ছব্ড়ি পিঠা খাই।
চারমাস বরষা 'পুখুরনা' যাই,
পুখুরনা থেকে দেখতে পেলম দুয়ারে দুটি মরাই।
ছোট মরাইয়ে হাত দিয়ে বড় মরাইয়ে পা দিয়ে
রাই উঠছেন রাই উঠছেন শিবগঙ্গার ঘাটে
কার হাতে গো ফুলের সাজি দাও গো রাইয়ের হাতে।

রক্তচন্দন ঘসি ঘসি মা ফুল চন্দন ডালা,
উঠ উঠ ছড়া ছুব মা দুগ্‌গার তলা।
মা দুগ্‌গার তলাতে ছোট বড় লাড়ু।
আমাদের রাইয়ের হাতে সুবর্ণের খাড়ু॥

৪১

আয়রে ময়রা ধররে ঝাঁঝরা দেরে চিনির পাগ করে
টুসু যাবেন শ্বশুর বাড়ী দ্যারে হাঁড়ার সাত করে॥

৪২

আম কাঁঠালের বাগান ছুব ছায়ায় ছায়ায় যাবে।
সানে বাঁধা পুকুর ছুব ঠাণ্ডা জল খাতে।
গছা গছা মালা ছুব শাউড়ী ভুলাতে।
ভুল ভুল ভুল শাউড়ী মা দিয়েছেন মালা গো।
মালার শিরে রক্তচন্দন পদে রক্ত জবা গো।

৪৩

উঠ উঠ উঠ টুসু উঠ করাতে এসেছি,
তুমার সব সঙ্গিরা পা তলাতে বসেছি।
যেমনি চাঁদকে তারায় ঘিরে
তেমনি ঘেরণ ঘেরেছি।

৪৪

সাঁঝ লাও সলিতা লাও মা সগ্‌গে লাও মা বাতি গো,
যত দ্যাবতার সন্ধ্যা লাও মা লক্ষ্মী সুরস্বতী গো।
উপরে দুগগা চিনি মণ্ডা পাতালে ভগবতী।*

---

* এই গানটির অন্য একটি পাঠ—
সান দিলম, সলিতা দিলম,
দিলম স্বর্গে বাতি গো,
যত দেবতা সন্ধ্যা লাও মা
লক্ষ্মী সরস্বতী গো।

৪৫

বড় বনের লতাপাতা ছোটবনের শালপাতা
কন বনে হারালে টুসু সোনায় বাঁধা নীল ছাতা।

৪৬

আকালে পুষিলাম পায়রা দুধ ভাত দিয়ে
সুকালে পালাল পায়রা আমায় দুখু দিয়ে গো
কন দেশকে যাবি পায়রা সেই দেশকে যাব গো।

৪৭

ডি ডি ডি তুষুল (-) (অ) কার ঘরে বাজনা বাজে
মা দিয়েছেন মাথা বেঁধে বৌ দিয়েছেন ফুল গুঁজে।

৪৮

টুসু গেছেন কাল কুটিল কাল পাথর কুটিতে,
এত কেন দেরি তুষল লদীতে বান পড়েছে।
বানের উপর বান চেপেছে তার উপরে ভগবান,
ই বান যদি পার করে দাও সোনার ছাতা করব দান

৪৯

আঁচিরে পাঁচিরে পদ্ম, পদ্ম বৈ আর ফুটে না
টুসুর হাতে জোড়া পদ্ম ভমরা বৈ বসে না।
ভমর এল খাতা খাতা, রসিক দেখে সই পাতা।*

৫০

ওরে সাহেব দেরে টাকা দামী রাস্তা বাঁধাব,
তুলে দুব হাঁসা কাঁকর উপরে বালি ছড়াব।

* অনেক ভিন্ন পাঠের মধ্যে লক্ষণীয় একটি : 'আঁচিরে পাঁচিরে পা
কোন পদ্ম ফুটে নাই,/তুষুর হাতে ঢালা পদ্ম তাতেও ভ্রমর বসে নাই।'

৫১

বাড়ীর নাময় কুয়া কাটল্যাম কুয়াতে জল সরে না।
এমনি কুয়া নিঠুর হ্যল জবা ফুল বৈ ফুটে না।
জবা ফুলটি দেখতে সাদা, ডিংলা[২৩] ফুলটি খেসখেসা,
গোলাপ ফুলের বকে[২৪] কাঁটা টুস্থুর নাকে যায় রুএগা[২৫] ॥

৫২

ইকুলি উকুলি টুস্থু মাঝ কুলিতে ঈশারা।
আমার টুস্থু দালান দিচ্ছে সুরকি কুটতে যাস তোরা।

৫৩

কিয়া [২৬] ফুলের মচা
আমার টুস্থুর সংসারে ভালবাসা।
জড়া কাঁঠাল তলে,
যোলো ঘুঙুর বাজছে লো তালে তালে।

৫৪

বড় গাছে যে উঠলে তুষু বড় গাছে কি দুধ আছে,
পরের মাকে মা বলিলে তাই কি তুমার খেদ ঘুচে।

৫৫

বেলিয়াতোড়ের একটি ঝিঙা আমড়া বলে এনেছি,
ভাল করে রাঁধবি তুষু কুটুম খুঁজে এসেছি ॥

৫৬

বাঁদর ঘুরে চালে চালে বাঁদরের কি পা-টলে,
রামসীতাকে সঙ্গে করে বসে আছি গাছ তলে।

৫৭

ই ঘর কাদা উ ঘর কাদা বসাব লুয়ার পাটা
পাটায় বসে পান বনাব খেলাব ভাইয়ের ব্যাটা।

---

২৩ কুমড়া। ২৪ বোঁটা। ২৫ রেণু। ২৬ কেয়া, কেতকী।

৫৮

আমার তুষু সিনাতে[২৭] যায় হলুদ তেলের বাটি গো,
উয়ার তুষু সিনাতে যায় শুধু হাত লেড়ে গো।
আমার তুষু সিনিয়ে উঠল জড়া ঢাক বাজিয়ে
উয়ার তুষু সিনিয়ে উঠল জড়া কুকুর ভেঁকিয়ে।

আমার তুষু সিনিয়ে এল কি পরিতে হব গো,
বাসকায় আছে পাটের শাড়ী সে পরিতে হব গো।
উয়ার তুষু সিনিয়ে এল কি পরিতে হব গো,
কলা তলের ছঁচের লাতা সেই পরিতে হব গো।

৫৯

লইতন[২৮] পুকুড়ের পাড়ে কে চালাল ঘোল[২৯] গাড়ি,
ঘোল গাড়িতে লেখা আছে কাউচি কাটা পান খিলি।
গেজেটেতে এল খবর পানের বড় যন্ত্রণা,
বষ্টমদিগের মনের কষ্ট শহরে পান বিকায় না।

৬০

আখন গেউড়া[৩০] বাঁশ গৌড়া কেটে করব ঘোল গাড়ি
ঘোল গাড়িতে চেপে যাব চিন্তা ময়রার ঘর বাড়ি।
চিন্তা ময়রা দালান দিচ্ছে ধারে ধারে কলাগাছ
কলা গাছে সরু বালি তুষু যে খেলা করে গো।
খেল না খেল না তুষু শাখা ভেঙে যাবে গো,
তুমার মা হতভাগী শাখা কুথায় পাবে গো?
শাঁখারিরা শাখা কাটে কদমতলায় বসে গো।

৬১

তুষুর লেগে বাঁধ দিলম, বাঁধ মনে লাগে না,
বাঁধ পানে চেয়ে দেখ পদ্মফুল বৈ ফুটে না।

২৭ স্নান করতে। ২৮ নতুন। ২৯ কল। ৩০ আকন্দ মূল

৬২

আমার টুসু হাল জুড়েছে ডাইনে বাঁয়ে লাল গরু
বেছে বেছে রাখব কামিন দাঁত কাল কমর সরু।

৬৩

বাঁকুড়াতে দেখে এলম সোনার কল্ল্যাচ[৩১] ফেলেছে
হা-ডু-ডু-ডু খেলতে যেয়ে পায়ে গুপা লেগেছে।

৬৪

বান এল বান বর্ষা এল ভেসে এল সহারী,[৩২]
আমার টুসু চেপে যাবে উয়ার টুসু কাহারী[৩৩]।

৬৫

কুলিতে কুলিতে যাব মড়ল ঘরে ধান লুব
এমনি সখের চাল করিব টাকায় সিকি লাভ লুব।
আর লুব না কাগজের টাকা, টাকা হইছেলো সিকি বাটা।

৬৬

মাগো মাগো উলখি[৩৪] লুব, তিতি[৩৫] সাপের খুন টুলি[৩৬]
বিষে অন্তর জর জর টুসু ধনকে হারালি।

৬৭

বাড়ীর নাময় দুধের পুকুর চাদর ছেড়ে সাঁতুরব
রাজার ছেলের দেখা পেলে সুরগুঞ্জা ফুল পাতাব।

৬৮

ই চালে পুঁই উ চালে পুঁই পুঁইয়ের খাব মিচুড়ি
আর যাব না শ্বশুরবাড়ী, ধরে ঠুকবেক শাশুড়ী।
এক কিল সইলাম, দু' কিল সইলাম,
তিন কিলের সময় সইব না,
একবার যদি মা বাপ আসত তাদের পানে চাইতম না।

---

৩১ লাল কাঁকর মিশ্রিত মাটি। ৩২ সওয়ারী। ৩৩ মাঝি অর্থে
৩৪ উল্কি, গায়ের চামড়ার উপর অলংকরণ। ৩৫ চিতিবড়া
৩৬ সর্পফণা।

৬৯

মাগো মাগো ফুল করিব, ফুলকে আমি কি দুব,
বাজার যাব পয়সা পাব, ফুলকে ফুলন তেল দুব।

৭০

আল চালের ভাত রাঁধিলাম, পুনকা শাগের লাচারি[৩৭]
খর খর ভুজন কর যেতে হবে কেছারি।
কেছারিতে নাই মা রাজা, রাজা হইছেন শ্রীহরি
রাজার গলায় চন্দমালা রানীর গলায় বেল মালা।

৭১

রাত ফুরাল প্রভাত এল মাথা বাঁধ মা জননী,
আমার কাছে কাঁদিস না মা, না বিদায় দুব আমি।

৭২

মাথা বাধলম পাতা কাটল্যাম
বাপের ঘর যাবার লেগে।
গুণের ননদ কাঁদতে বসল বাসক ফুলের ডাল ধরে
আর কেঁদ না গুণের ননদ আসব মাসের শেষ করে।

৭৩

তিরিশ দিন রাখিলাম মাকে তেল সলিতা দিয়ে গো
আর রাখিতে লারিলাম মাকে মকর আইছে লিতে গো
চাছি খাও মা ছেনা খাও মা ওদর ভরে গো
কাল সকালে চলে যাবে একবার ফিরে চাও গো।

৭৪

জলে হেলা জলে খেলা জলে তুমার কে আছে
লক্ষ্য করে দেখ তুসু জলে তুমার ঘর আছে।

৭৫

লইতন পুকুরের পাড়ে পায়রা গুম গুম করে গো

৩৭ রসালো তরকারি বিশেষ।

পায়রা লয় মা, পাখি লয় মা, তুষল খেলা করে গো,
খেল না খেল না তুষল শাঁখা ময়লা হবে গো।

৭৬

শালুক ডাঁটার ঘর করিলাম স্যাকের প্যাকের করে গো
কাল আনিব পরের বিটি পাছে ভিজে মরে গো।

৭৭

ই চালে লাউ, উ চালে লাউ, লাউ পেড়েছে বাগালে
ইবার বাগাল ধরা পড়লে ছোট রাজার মহলে।

৭৮

অ্যারদা[৩৮] ফুলের গ্যারদা[৩৯] মালা টগর ফুলের বিছানা
পাশ ঘুরে শুয় না তুষু ভেঙে যাবে গহনা।

৭৯

বাঁকুড়াতে দেখে এলম ডালা ডালা ছধবালা
তুষুর কোলে নাই মা ছেলে কারে দুব দুধবালা।

৮০

বাঁকুড়াতে দেখে এলম তিনটি তুষু যায় চলে।
হায়রে গেঞ্জায়[৪০] নাইরে পয়সা লিতাম তুষু দর করে।

৮১

গাঁকে এল সরু শাখা বড় বউয়ের মুখ বাঁকা,
হালের গরু বিকে দাদা বড় বউকে দাও শাখা।

৮২

বাঁকুড়াতে দেখে এলম সোনার পিঁড়ায় বাঘ বসে
সে বাঘে কি মানুষ খায় মা বসে বসে রং ছাখে।

৮৩

আমার তুষু মান করেছে ই পাঁড়ার তামাল তলে

৩৮ ভিজা, শিশির সিক্ত। ৩৯ টাটকা (গাদর>গ্যাদ্‌রা)।
৪০ সুতোর জালবোনা কোমরে বাঁধা টাকা পয়সা রাখার থলি

আনরে সন্দেশ থালে করে মান ভাঙ্গাই সবাই মিলে।
উয়ার তুষু মান করেছে উ পাড়ার তামাল তলে
আনরে জুমড়া[৪১] হাতে করে ধাসব[৪২] রে সবাই মিলে।

৮৪

আমার তুষুর একটি ছেলে একা গেছে ক্যলকাতা
ভালয় ভালয় ঘুরবে তুষু কালীকে দুব জোড় পাঁঠা।

৮৫

সোল মাছের ষোল চাকা, মাগুর মাছের ছ চাকা,
ছ পাড়াতে বিলিয়ে আসবে, নামো পাড়ায় যেও না।
নামো পাড়ায় সতীন আছে পান দিলেও খেও না।
পানের ভিতর ওষুধ আছে ফিরে আসতেও হবে না।

৮৬

সোল মাছের ষোল চাকা আঞ্জির[৪৩] তলায় চপা [৪৪] লো
আমার তুষু ছেলের মা, লোকে বলে বাঁজা গো।

৮৭

মাছ বনাল্যম হুড়া হুড়া[৪৫] বুড়া বলে খাব না
খানেক রাতে বুড়া বলে আমি কি ভাগ পাব না।

৮৮

আমার তুষু ও পাড়া গেছে কঁাচাকলা কাটিতে,
আসতে কেন দেরী হল, অজয়ে বান পড়েছে।
অজয় ভেঙে বান পড়েছে, মিষ্টি ভেঙে জল খাব,
কোথায় আছো প্রাণের তুষু, তোমাকে নিয়ে পার হবো।

৮৯

বাড়ীর পাশে নারিকেল গাছটি, নারিকেল ডব ডুব করে গো,
রাত্রে বেলা কোকিল এসে তুষু মাকে ভুলায় গো।

---

৪১ জলন্ত কাঠ। ৪২ ঠেসে ধরবো। ৪৩ পিয়ারা। ৪৪ খোসা, ছাল। ৪৫ প্রচুর।

ভুল না, ভুল না তুষু ভাঙা পালকি এসেছে।
আয়না বসা পালকি দেবো
আম কাঁঠালের বাগান দেবো
ছায়ায় ছায়ায় যাবে গো।

৯০

বাগাল বাগাল করি আমরা বাগাল গেছে অনেক দূর,
মনে করে আনবে বাগাল শ্যামকাল্লার দুটি ফুল।
শ্যামকাল্লার দুটি ফুলে তুষু মাকে সাজাবো,
চারপাশে সখিদের রেখে তুষু নাচন দেখাবো।

৯১

বান এল, বন্যা এল, ভেসে এল কাঠবোঝা,
কাঠবোঝাটি উল্টে দেখি ওদের তুষুর হাত ভাঙা।

৯২

ত্রিশ দিন রাখিলাম মাকে ত্রিশ সলতা দিয়ে গো,
আর রাখিতে পারলাম না মাকে, মকর এস লিতে গো।
এসছো মকর বেশ করেছো, তুষু রাখবে যতনে,
আমরা সবাই আনতে যাবো পৌষ মাসের প্রথমে।*

৯৩

তুষুর মাকে বলেছিলাম, তুষুর বিয়ে দাও না গো,
বিয়ে দিতে ছেলে হল, লাতি কোলে নাও না গো।
লাতি নিলে বেশ করিলে কি কি গয়না দিলে গো?
হাতে দিলাম অঙ্গুরী, পায়ে দিলাম তড়া গো।
আর কি দেবো বল গো।
লাতি খুঁজে হাতি নিতে, হাতি কোথায় পাবো গো,

* এই বিদায়ের গানটি ভিন্ন ভিন্ন পাঠে বহু জায়গায় পাওয়া গেছে।

বিষ্ণুপুরের রাজার হাতি বাঁকুড়াতে চালাবো,
চারপাশে চার খুপুর[৪৬] বেঁধে বামুন ভোজন করাবো।

৯৪

এতদিন যে রইলেন তুষু মা বলে তো ডাকলে না
যাবার সময় বায়না নিলে, মাকে ছেড়ে যাবো না।

৯৫

আমার তুষু স্নান করে সান বাঁধানো ঘাটেতে,
ওদের তুষু স্নান করে পচা বাঁধের ঘাটেতে।
আমার তুষুর স্নান হল কি পরিতে দেবো গো,
আলনায় আছে পাঠের শাড়ী তাকে পরতে দাও না গো।
ওদের তুষুর স্নান হলো কি পরিতে দেবে গো,
ঢেঁকিশালায় আছে ঘটিমাজা ন্যকড়া তাকে পরতে দাও না গো।
আমার তুষুর শাড়ী পরা হল কি খাইতে দেবো গো,
শিখায় আছে দই সন্দেশ তাকে খাতে দাও না গো।
ওদের তুষুর কাপড় পরা হল, কি খাইতে দেবে গো,
হাড়িতে আছে পান্তা ভাত তাকে খেতে দাও না গো।
আমার তুষুর খাওয়া হল কিসে শুতে দেবো গো,
পালঙ্কের উপর গদি বিছিয়ে তাথে শুতে দাও না গো।
ওদের তুষুর খাওয়া হল কিসে শুঁতে দেবো গো,
গোয়ালে আছে ঘাস বোঝা তাতে শুঁতে দাও না গো॥ *

৯৬

আমার তুষুর এক পিঠ চুল, জামাই মনে লাগে না,
জামাই করে আনাগোনা, তুষু পাঠান হবে না।

৪৬ খুপরি, ছোট ঘর বা মঞ্চ।
* পৌষ সংক্রান্তির দিন সকালে তুষু ভাসাতে যাবার সময় এ গান গাওয়া হয়। এই ধরণের গান নানা স্থান থেকে এসেছে আমাদের সংগ্রহে।

যদিও বা পাঠানো হত একশ' টাকার মাথা বাঁধা।
দু'শ' টাকার চুল গো
তিন শ' টাকার মাথা বেঁধে তুষু পাঠানো হবে গো॥

৯৭

এক বাণ্ডিল গুলি সুতো চালে চালে খাটাবো।
ওদের তুষুকে ডেকে এনে তালে তালে নাচাবো॥

৯৮

আমার তুষু মুড়ি ভাজে, চুড়ি ঝলমল করে গো,
ওদের তুষু মুড়ি ভাজে হাতা ঠক্ ঠক্ করে গো।
আমার তুষু মুড়ি ছাঁকে সন্না ফুলের মতন গো
ওদের তুষু অভাগিনী আঁচল পেতে মাগে গো॥*

৯৯

জলে হেলা জলে খেলা জলে তুসুর কে আছে?
অন্তরে ভেবে দেখ মা, জলে তোমার সব আছে।

১০০

ওপর পাটা, নামো পাটা, তার ভিতরে দারগা
ও দারগা পথ ছেড়ে দাও, তুসু যাবে কলকাতা।
কলকাতা যে গেছলে তুসু কি কি দেখে এলে গো?
তুসু বলে দেখে এলাম—সোনার খাঁচায় বাগ বসে!

১০১

ও পাড়া যেও না তুসু, ও পাড়াতে সতীন আছে।
জল দিলে জল খেও না, পান দিলে পান খেও না
পানের ভেতর ঔষধ দিবে, মা বলিতে পাবে না।

* এই গানটির নানা পাঠ পাওয়া যায়। যেমন—'আমার তিষু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝলমল করে গো./উয়ার তিষু নেকা ছুঁড়ি আঁচল পেতে খুঁজে গো'। সজিনা>সন্না।

১০২

এক পাই পস্তু কিনে তাঁমলি বাঁধের পাড়ে ছড়াবো।
ওদের তুসুকে ডেকে এনে, পয়রা খুঁটা করাবো।

১০৩

আমার তুসু খায় না খাড়া বাজারে দেয় হাতনাড়া,
উয়ার তুসু খায় লো খাড়া সকলে দেয় লাকঝাড়া।
ঠেঙার উপর ঠেঙা, উয়ার তুসু বারো হাত ঢেঙা।[৪৭]
শিল শিল শিল, উয়ার তুসু উড়ছে যেন চিল।

১০৪

তুসু তুসু করে সবে তুসু কুথায় আছ গো ?
ইখান খুঁজি উখান খুঁজি, খুঁজে নাহি পাই গো।
কুথায় লুকাইলে আমার সোনা তুসু ধন গো।
বেরায় এস তুসু ধন দিবে কত দুখ গো।
তুমার লেগে পরাণ আমার কাঁদে কাঁদে মরে গো।
পোষ পরব চলে আল, মোদের ঘরে এসো গো।
শঙ্খ বাজিয়ে বরণ করে লিয়ে তুমায় যাবো গো।
তুসু তুসু করে সবে তুসু কুথায় আছ গো।

১০৫

আমার তুসু মান করেছে, কি দিয়ে মান ভাঙাব।
বাকসায় আছে পাটনাই শাড়ী তুসু ধনকে পরাব।
ওগো শাড়ী দিয়ে মান ভাঙাবো।

১০৬

তুসু যাবেক রেল দেখতে কলকেতা শহরে
আমায় ছাড়ে যেতে লারে—
উয়ার মন কেমন কেমন করে।

---

৪৭ লম্বা

১০৭

উড়া জাহাজ দেখবেক বলে তুসু ধরে বায়না।
হাতে পওসা নাই যে মোটে কিছুতে উ বুঝে না।
তুমরা কেউ লিয়ে যাও তুসুকে সঙ করে,
মান করে আমার তুসু সোনার অঙ্গ কালি করে।

১০৮

একটি গণ্ডী দুটি গণ্ডী তিনটি গণ্ডী পেরিয়ে
অশোক বনে পাতালপুরী ভিক্ষা দাও মা জননী।
লক্ষ্মণ গেছে গোচারণে—আমি ভিক্ষার কি জানি॥
একটা গণ্ডী দুটি গণ্ডী—সীতা চুরি করেছে।
সীতা গেলে সীতা পাবো ভাই নয়নার ঘরে যাব।
এগনার মাঝে তুলসী গাছটি, তুলসী ঝুর ঝুর করে গো।
এগনার মাঝে সোনার মিগ যায় চলে,
উঠ উঠ লক্ষ্মণ দেওর সোনার মিগ দাও ধরে॥

১০৯

কদম গাছে উঠলে তুসু কচি কদম পেড়ো না,
পাকলে কদম সবাই খাবে কউতো মানা করবে না।

১১০

আটচালা চণ্ডীমালা বাসক ফুলের বিছানা,
তুসু মায়ের বিছানাতে রইল সোনার চিকদানা।

১১১

টুসু দেখতে এলে তুমরা বোস তুসুর পা তলে,
এক জামবাটী ফেন রেখেছি খাওগা সব পেট ভরে।
উ পাড়াতে টুসু দেখতে গেলম বসতে দিল মাচুলী,[৪৮]
মাচুলীর তলে ছিল ছুঁচা খেলেক ছুঁড়ির চোখ দুটি।

৪৮ বসবার জন্য দড়ি দিয়ে বোনা ছোট চারপায়া

১১২

কাঠের ঢেঁকি ঠাটের খেলা পকুর গেবে বোসাব।
উয়ার তুসু ডেকে এনে চিঁড়া কুটা করাব॥
আমাদের এই এগনার মাঝে বাণ্ডিল সুতা টাঙাব।
উয়ার তুসু ডেকে এনে জুতা সেলাই করাব॥
এক পওসার ছোলা ভাজা এগনার মাঝে ছড়াব।
উয়ার তুসু ডেকে এনে খুঁটে খাওয়া করাব।

১১৩

তুই কি পারবি আমাকে—
লিরিপুরে লিরি ছুঁড়ি সেউ লেরেছে আমাকে।
ভালিস না মোটা মোটা—
কেটে করবো লাঙলে গোট।
ভালচু[৪৯] কি মোটা মোটা[৫০] তোর তুয়ারে চালাব মটর॥

১১৪

আমার তুসু চাষ করেছে ডাইনে বাঁয়ে লাল গরু।
আমার তুসু কামিন[৫১] রাখবে দাঁত মোটা কোমর সরু॥

১১৫

বড় বাঁধে যাস্ না তুসু উখানেতে ভূত আছে।
কি করে জানব তুসু কার কপালে কি আছে॥
উপর কূলে গেছলে তুসু নামো কূলে যেয়ো না।
উখানেতে সতীন আছে পান দিলে পান খায়ো না॥

১১৬

বিষ্টুপুরে দেখে এলম সোনা তুসু যায় চলে,
হাতে আমার পয়সা নাই লো লিতম তুসু দর করে।
বিষ্টুপুরের তুসু খুঁজে লো ঝাড়ের আলো

৪৯ দেখছিস। ৫০ ডাগর ডাগর চোখে। ৫১ মহিলা শ্রমিক

আমার তুসু যেমন তেমন উয়ার তুসু দমে কালো।
আমার তুসুর বড় দোষ কুলতলা বই খেলে না।
কোন সতীনে ধুলা দিলে লো সে দাগ আর গেলো না।

১১৭

ভর্তি পুকুর খলবল[৫২] করে জাম তলাতে য[৫৩] লিলে,
ভাগ্যে ছিলে আমার তুসু সাহেব লিয়ে দাঁড়ালে।
তুসু যায় মা জলে জলে, সাহেব যায় মা জল ধারে
জলে জলা করে খেলা—জলেতে মা কি আছে?
জলে আমার শ্বশুর ঘর আছে।

১১৮

তুষলা গো রাই তোমার দৌলতে ছ' বুঁড়ি ঘুঁটে পাই।
তুষলা গো রাই ছ' বুড়ি ল' বুড়ি ঘুটি নটি লাড়ু পাই।
তুষলা গো রাই সব ঠাকুরকে লাড়ু দিলাম তোমার কটি চাই?
পাঁচটি লাড়ু, নটি লাড়ু যে যার নিয়ম আছে,
ছ'বুড়ি পিঠা খেয়ে যেন ধন পুত্র বাঁচে।
চাঁপা গেঁদাটি তুলতে গেলাম তুষলা মায়ের তরে
তার তলাতে হরগৌরী সদাই নৃত্য করে।
ছাঁচা কোলে দুর্ব্বাঘাস লহ লহ করে
আজ আমাদের কি সৌভাগ্য শিবদুর্গা ঘরে॥

১১৯

তুষুলী এয়োরাণী এয়োতি ভাগ্যমানী-
তুমি শক্তিস্বরূপিনী সতী সাধ্বী কল্যাণী
পূজি তোমার চরণ দুখানি।
তুঁষ তুঁষলা কাঁধে ছাতি, বাপমার ধন যাচাযাচি,
স্বামীর ধন ধনপতি, করজোড়ে করি স্তুতি।

৫২ টলমল, উচ্ছল। ৫৩ আস্তানা, সুযোগ, ঘাঁটি।

ঘর করবো নগরে, মরবো গিয়ে সাগরে,
জন্মিব উত্তম কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে।

১২০

তুষলী গো রাই, তোমায় পূজিয়ে আমি কি বর পাই—
আমার গুরু বাপ চাই, ধন সাগরে মা চাই,
রাজ্যেশ্বর স্বামী চাই, দরবার শোভা বেটা চাই,
সিঁথির সিন্দুর দপদপ করে,
হাতের লোহা ঝকঝক করে,
ছ'বুড়ি ছ'টি ক্ষীরের নাড়ু, শাঁখের আগে সুবর্ণর খাড়ু।

১২১

রাত পোহাল ডাকছে কোকিল ফুল তুলিতে যাই চল,
যুই চামেলি চাঁপার কলি বেল বেলা গেঁদা ফুল।
তুষলা পূজিব আমরা যতেক রমণীকূল।
ফুলের গয়না ফুলহার তাগা বালা কানের দুল।
থালা ভর্তি শীতল দিব, সঙ্গে দিব মুলার ফুল॥

১২২

বাড়ীর ভিতর কলা বাগান তুষু খেলা করে গো।
খেলো না খেলো না তুষু শাঁখা ভেঙ্গে যাবে গো।
তোমার মা যে অভাগিনী শাঁখা কোথায় পাবে গো।
ঘরকে এলে সরু শাঁখা তাও মনে লাগবে না।
শাঁখারিরা শাঁখা কাটে, কাটে গো কদমকলি,
কাটে যত মিহি শাঁখা শাঁখের পদক মাদুলি॥

১২৩

ওদের বাড়ী যাও না তুষু, ভুল করে পান সেজেছে,
ঘুমের ঘোরে ঢুলে ঢুলে এলাচ দিতে ভুলেছে।

৫৪ শাঁখার।

ঢাকের বাদ্যে ও তুষলা বাঁকুড়া জেলা বেড়াব,
হাজার টাকার আতস বাজি পরকুলেতেই পুড়াব ॥

১২৪

সংক্রান্তির ঐ নিশি শেষে মকর আসছেন নিতে গো।
ভেলায় চড়ে ও তুষলা কোন সুদূরে যাবে গো।
একমাস রাখিলাম মাকে কুঁচির কপাটে গো।
আর রাখিতে পারি নাই মা লোহার কপাটে গো।
তের চূড়া ভেলা* তুষুর প্রদীপ-খলা তাতে গো।
এয়োরাণী ও তুষুধন তোমার নাগাল কি পাব ?
তোমায় ছেড়ে মনস্তাপে জোড়া মকর ডুব দিব ॥

১২৫

মলিন কেন মুখ শশী, ও তুষু ধন কও কথা !
কি হয়েছে মনের বেদন, বল কি মনের ব্যথা ?
মকর আসছে তোমায় নিতে, তোমায় ছেড়ে যাই কোথা।
চাঁউড়ী বাঁউড়ী** তুদিন আগে, ধরেছে আমার মাথা।
এ বৎসরের নতুন তুষু যাবে কি দেশান্তরে—
আর বৎসরের এমনি দিন দেখা দিও দাসীরে।
তুমি গো মা সতী লক্ষ্মী তাই পূজি মা তোমারে,
ধন পুত্র বজায় রেখে মরি যেন সাগরে ॥

১২৬

এ নদী যাই ও নদী যাই কোন্ নদীতে করি স্নান,
সোনারবরণী তুষু হয়ে গেল অন্তর্ধান।

* এই ধরণের ভেলার জন্য বিষ্ণুপুর বিখ্যাত।

** আওনি, চাওনি, বাওনি>আঁউড়ি, চাঁউড়ি, বাঁউড়ি। পৌষ সংক্রান্তির আগের তিন দিনের দিন আঁউড়ি-লক্ষ্মী আহ্বানের দিন, চাঁউড়ি—এ দিন লক্ষ্মী চাহেন, অর্থাৎ কৃপাদৃষ্টি দেন, বাঁউড়ি—লক্ষ্মী গৃহে বন্দিনী হন। তার পরের দিনই পৌষ সংক্রান্তি।

ও তুষুলী, ও তুষুলী, আমাকে কি দিলেন বর !
হাতের শাখা সিতায় সিঁন্দুর স্বামীকে কর অমর।
ধনপুত্রে সুখী যেমন নাতি নাতনাই জুড়ে ঘর,
রাজাধিরাজ হবে জামাই ভাই যেন হয় রত্নাকর ॥

১২৭

তুষুলী গেল ভেসে, বাপ মা এলো হেসে,
শ্বশুর শাশুড়ী স্বামীপুত্র সকল এলো হেসে।
সোনার ভেলায় বসে তুষলা গেল ভেসে,
ধনদৌলত টাকাকড়ি সকল এল হেসে।

১২৮

টুসু আইচে দেশে, রাঙা চরণ পুছাব মাথার কেশে।
বিষ্ণুপুরের সাদা ঘোড়া কাদায় ভিন্নো চলে না।
যন্ দাঁড়াবে ঘোড়া সেইখেনে জরিমানা।
গাড়ি এলো খাতা খাতা এ গাড়িতে লোক কুথা,
টিপনি কলটি টিপে দিলে চলে যাবে কলকাতা।

১২৯

এক সড়পে[৫৬] দু সড়পে তিন সড়পে লোক চলে
আমার টুসুর এমনি চলন মিন[৫৭] বাতাসে গা দুলে।
উপর কোঠায় উঠলে তুসু সরু করে ছঁচ্ দিবে,
নামবার সময় মনে করে শিবের মাথায় ফুল দিবে।

১৩০

গাড়ি এল দুল দুলায়ে দেখরে সতীন বেরিয়ে,
সাদের[৫৮] গাড়ি চলে গেল বুড়া বাঁশী ফুক দিয়ে।
মায়ে দিল মাথা বেঁধে দে গো মামী ফুল গুঁজে
তোদের জামাই দাঁড়িই আছে করবরীর ডাল ধরে।

৫৬ রাস্তায়। ৫৭ বিনা। ৫৮ সাধের।

১৩১

কে কাঁদে, কে কাঁদে, কে কাঁদে দালান ধরে
টুসু মায়ের মা কাঁদে গো নীলমণি কোলে করে
বাইরের শোবা[৫৯] আঁচির পাঁচির, ঘরের শোবা বাগিচা,
তার অতীত শোবা যার কোলে দামাল ছেলা গো।

১৩২

বৃন্দাবনের মানের পূজা তোরা দেখবি যদি আয়
কত যত্ন করে রাধার পায়ে ধরে ছিলেন শ্যামরায়।
শ্রীরাধিকার মানের জন্ম ধরে ছিলে চরণে,
চরণ ধরে গড়াগড়ি সেদিন কি আর নাই মনে ?
শুন গো রাই, শুক সারীরা করি তোমায় নিবেদন
কার কুঞ্জেতে আছেন বাঁকা, করে আয়রে দরশন।
সারা নিশি রাই রূপসী জাগিয়ে স্বামী স্ত্রী,
বিভাবরী বঞ্চিলেন চন্দ্রাবলীর মন্দিরে।

১৩৩

শেফালিকা পুষ্পখুশী পড়ে গো অভিরত,
ও ললিতা দেখ গো চেয়ে নিশি হল প্রভাত।
প্রভাত হইল নিশি শুন গো সহচরী,
হায় কেন এলো না কুঞ্জে সে বাঁকা বংশীধারী।
বৃন্দা বলে শুন গো ধনি ধৈর্য ধর অন্তরে,
চলিলম কিশোরী আমি আনিতে নটবরে।
বৃন্দের কথা শুনি তখন চলিল রাধার সারী
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে বসে আছেন গো বংশীধারী।

১৩৪

দহির উপর সরা রাখি ডাকি বলে সকলে—
দহি লে হে ব্রজরাজ, দহি লে হে ব্রজরাজ।

---

৫৯ শোভা।

দহির উপর সরা রাখি ডাকি বলে সকলে—
দহি লে দহি লে বলে কে ডাকে উচ্চস্বরে।
দ্বারি আসি বলে তোরা কেন এত কর গোল,
কি জাতি তুমারো ওগো কুথায় তোদের বাসরতল ?
বলিলেন, ব্রজরাজ হেথায় কোথায় ব্রজরাজ
মথুরা নগরে তোদের কিষ্টচন্দ্র মহারাজ।

১৩৫

বনে বেড়ায় বনবেহারী, বনে বাজান বাঁশরী
নিঠুর কালা সঙ্গে হরি ও বাঁকা বংশীধারী
রাখাল ছেলে রাজা হল, ভুলেছ কি বাঁশরী গান,
আমরা নারী লাজে মরি, নাই বন্ধু তোমার লাজ!
লাজবরণ কেড়ে নিয়ে পরাব পীতধড়া।
মটুক[৬০] করিয়া চূর্ণ শিরেতে দিব চূড়া।
দশক্ষত দেখাইব, এখানে আনিব তায়
শ্রীরাধারো স্বামী বলে জানাইব মথুরায়।
নৌকা করে টলবল ছলকে উঠিল জল
লাজ নাই তোমার বংশীধারী মুখে হাস খল খল।
কি করি উপায় গো সখি, কি করি উপায় বল
রাধার বিরহানলে প্রাণ আমার আকুল হল।
হরি বলেন, যাবো আমি শ্রীরাধিকার কুঞ্জবন
ফুলশয্যা করে রাধা বসে আছেন অনেকক্ষণ।
কুঞ্জে যেতে বৃন্দে তুমি দিও না আমায় বাধা,
দেখিব কেমন আছে আমার মানিনী রাধা।

১৩৬

কানাই নাই মোর ব্রজপুরে, তরুতে ফোটে না ফুল,
বৃন্দে বলে ও ললিতে কেন লো মজালে কুল।

---

৬০ মুকুট।

কুল মজালাম, মন মজালাম, তবু তারে পেলাম না,
যেথায় থেক প্রেম রেখো শ্রীরাধায় পাশর না।
সবাই বলে কাল কাল, কাল লয় মা রাইধনি,
গজেন্দ্রগমনে চলে কাল মেঘের বিজুলী।
বেরা গো রাই, বেরা গো রাই, বেরা গো চাঁদের মালা,
কদমতলায় মেঘ নেমেছে, মেঘ লয় গো কাল সোনা।
এত কিসের মান লো রাধে এত মান তুই করিস না,
মানে খান্ত কর গো রাধে-হয়েছি খেপার পারা।
ওরে ওরে মন-ভমরা উঠে বসলি কার চালে,
আপন নয়রে মন ভোমরা বেঁদে রাখতাম পেম ডোরে।
ই ফুলও বাগানে কত রঙ্গ ভিঙ্গ উড়িছে,
পাঁচ ফুলের ভমরা তুমি এক ফুলে কি মন মজেছে!
চন্দ্রাবলী চাঁপার কলি কাজ কি হে শিমূল ফুলে
উঠে যেতে বল গো শামকে, সোনার অঙ্গ যায় জ্বলে।

১৩৭

যেন পূন্নিমা চাঁদের আলো,
ভাত রাধে গো সজনী ভাল।
নিশি লেগে গেছে কড়ে কড়,[৬১]
বল সদাগো[৬২] নিশির কত দর।
তোর দোকানে নাই দারচিনি
তুই নাকিরে বড় দোকানী॥

১৩৮

তুই করিস না ফটর ফটর
তোর দুয়ারে ছুট'ব মটর।

৬১ দাঁতের ফাকে ফাকে ও মাড়িতে। ৬২ সদাগর।

১৩৯

তোর কাপড়ের পাড় ভাল,
এলি বলে তাই দেখা হল।
তোকে দেখেছিলম পরকূলে
চাপ গেঁদা ফুল কাপড়ের পাড়ে।

১৪০

চুল বসে না চিরুনীর দোষে
আমি থাকব না ই ভারতে।

১৪১

চলো তুসু মকর পাতাব, আমরা হাবড়ার ঘাটে গা ধুব।
তোকো মারব লো আলাপালি,[৬৩] মাকড়া দ'য়ের করকরা বালি
তোকে ঘুরাব লাইন ধারে, মেঘ জমিয়া আঁদার বাদলে।

১৪২

আমার তুসুর বিয়া দুব ইষ্টিশানের বাবুকে,
ওলো তুসু ভালই হলো চাপবি কত গাড়িতে।
আহা-হা তুসুর রূপের কত সিষোমা
চেয়ো চেয়ো গেল আমার কাজলপরা জড়া আঁখি।
তুসু তোর তরে কদমতলে কে থাকে।
তুসু বিনে কিছুই না জানি।
তুসু আমার গলার হার, তুসু আমার মুখের পান,
তুসু আমার আয়না চিরুণী,
তুসু বিনে কিছুই না জানি।

১৪৩

তুসুকে রাখিব আমি পদ্ম করে মন্দিরে
লিতে পায় না যেন সিঁধ কেটে কোন চোরে।

৬৩ পরম্পর, একের পর এক

শ্রী কিষ্ট বিরহে পারি, ধৈর্য ধরিতে নারি
হা কিষ্ট হা কিষ্ট বলে কাঁদে গো উচ্চস্বরে।
কিষ্ট কোথা কিষ্ট কোথা দেখ গো সখি আমার,
কিষ্ট বিনে প্রাণ বাঁচে না আমার শাম।
ও ললিতা ও বিশাখা দেখ গো রাধার কি হলো
এখনি যে চাঁদ বদনি কিষ্ট নাম নিতেছিল।
নীলাম্বরী পর গো রাধে, পর গো সন্ন আভরণ
তুমারই নিকুঞ্জবনে আসিবেন কিষ্ট ধন।
আলতি, মালতি, যতি করলো ফুলের বিছানা,
তুমারই নিকুঞ্জবনে কালসোনা।
কালচূড়া বাঁকবেহারী ও রমণীর মনচোরা,
চন্দাবলীর কুঞ্জে যেয়ে সব রমণী যায় ভুলা।
চন্দাবলীর শত চন্দ উদয় হয় তার নখেতে,
যাবে না তো কেন এলে রাধার মনে জ্বালা দিতে।
যে করে না মনোযোগ মন করে তারও আশা,
গৃহেতে বসিয়ে কাঁদি দেখে যাও আমার দশা।
করি শয্যা পেলম লজ্জা, এমুখো না দেখাবো,
আরও তাকে না হেরিব প্রাণে য'দিন বাঁচিবো।
মনচোরা ধন চুরি করে উঠল গিয়ে কার ঘরে,
মরি মনের মনোদুখে বোল না কারো কাছে।

১৪৪

বাড়ীর নাময় কুইল[৬৪] গাছটি কুইল ভদ্‌ভদ্‌ করে গো
খানিক রেতে কোকিল এসে তুষু খেলা করে গো।
খেল না খেল না তুষু ভেঙে যাবে শাখা গো
তোমার মা যে অভাগিনী শাখা কোথায় পাবে গো।

---

৬৪ পরকুল।

১৪৫

উপরে ঝাটা তলে পাটা তার উপরে দারোগা।
ও দারোগা পথ ছেড়ে দাও, তুষু যাবেন কলকাতা।
কলকাতা যে গেছলেন তুষু কি কি সন্দেশ উঠেছে?
ইলির মিলির ঝিলির সন্দেশ ফুলাম [৬৫] তেলে ছেঁকেছে।
কলকাতা যে গেছলেন তুষু, কার কতটা চুল আছে?
চুলের কথা বলব কি আর পিঠ ভেঙে চুল পড়েছে।
কলকাতা যে গেছলেন তুষু কি কি শাড়ী উঠেছে?
বেনারসী শাড়ী মাগো তার উপরে ছাপ আছে।

১৪৬

কুইল গাছে কুহুলি ডাকে ডালিম গাছে ক্যারক্যাটা, [৬৬]
আমার তুষু ফাঁদ এঁটেছে, পড়েছে রাজার ব্যাটা।
রাজার ব্যাটা পদ্ম কাঁটা দাঁতে কুলুপ লাগিছে
আমার তুষু এক চাপড়ে দাঁতের কুলুপ ছাড়িছে।

১৪৭

চারকুণা পথুরের পাড়ে পায়রা গুম গুম করে গো,
পায়রা লয় মা, পক্ষি লয় মা, তুষু খেলা করে গো।
খেল না, খেল না তুষু, তুমারে যে লিতে আইচে,
মায়ে বলে দে পাঠিয়ে, বাপে বলে দে পাঠিয়ে,
ভাইয়ে বলে ছোট বুনটি, কাঁদিয়ে পাঠাব না,
কাঁদিয়ে পাঠাব না।

১৪৮

বাড়ীর নাময় খয়ের গাছটি কেটে করব কলগাড়ী,
কলগাড়ীতে চেপে যাবো নগেন দত্তের ঘরবাড়ী।

৬৫ ফুলন, সুগন্ধ। ৬৬ এক ধরণের পাখী

নগেন দত্ত মরে গেলে বাইস্‌কোপটাই চালাব,
বাইস্‌কোপটাই চালাত চালাত হাজার টাকা কুড়াব।

১৪৯

ও দামোদর, ও দামোদর, কোন ঘাটে সরু বালি ?
আমার তুষুর বিয়া হুব যার ঘরে সনার ঝারি।
ও দামোদর, ও দামোদর, কোন ঘাটে মোটা বালি ?
উয়ার তুষুর বিয়া হুব যার ঘরে টকা[৬৭] ডালি।

১৫০

ও রামের মা, ও রামের মা রাম কেন ধূলায় পড়ে ?
ছোট ভাজের এমনি মায়া ধুলা ঝেড়ে লেই কোলে।
রামের পায়ে সোনার নূপুর বাজে লো অশোকবনে।
অশোক বনের পাতর কুড়ায় সীতা পাশা খেলেছে।
যোগীর বেশে রাবণ এসে সীতা হরণ করেছে।
সীতা হরণ করলি রাবণ রাখবি সীতাক যতনে।
দেখবো রে তোর সোনার লংকা হুবরে ডাহন[৬৮] করে।
রাম ছেড়েছেন যজ্ঞের ঘোড়া, সে ঘোড়াকে কে ধরে ?
লব কুশে ধরেছে ঘোড়া চাবুক মেরে বশ করে।

১৫১

বাঁকুড়াতে দেখে এলম সোনার পিড়ায় বাঘ বসে।
সে বাঘে কি মানুষ খায় মা, বাঘ বসে রঙ দেখে।
বাঁকুড়াতে দেখে এলম্ শিকড়ে আম ধরেছে,
দুর্গার বিটি সরস্বতী এক হাতে চুল বেঁধেছে।

১৫২

শালুক ডাঁটার ঘর করেছি ঙ্যাকের প্যাঁকের করে গো,
কাল এনেছি পরের বিটি পাছে ভিজে মরে গো।

৬৭ বাঁশ চেরাত্তি দিয়ে তৈরী চাল ধোওয়ার পাত্র বিশেষ। ৬৮ দহন।

১৫৩

ফুল চিরুণী আরশি হাতে বোস মা লাল চৌকিতে,
মাথায় দাও মা সীতা, লক্ষ্মী, তোমারই রাম এসেছে।
রাম এসেছে তপস্যাতে, আজকে রামের অধিবাস।
রাম যদি রে যাবি বনে গাছের বাকল পরে,
সীতা যাচ্ছেন কাঁদতে কাঁদতে লক্ষ্মণ যায় ছাতা ধরে।
লক্ষ্মণ পড়লেন শক্তিশেলে রামের চোখে বয় ধারা,
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, প্রাণ লক্ষ্মণ, প্রাণনদীর সাহারা।
অ প্রাণনাথ আমার কিরা[৬৯] ওই হরিণটি দাও ধরে,
ধরিতে না পারি হরিণ, তোমায় মেরে দেবো গো।

১৫৪

পঞ্চমাস গর্ভ সীতা রাম পাঠালেন তপোবন,
রাম লক্ষ্মণ রেখে এলো যেখানে অরুণ্য[৭০] বন।
অরুণ্যার বনে সীতা একা পাশা খেলেছে।
যোগীর বেশে রাবণ এসে সীতা হরণ করেছে।
সীতা হরণ করলি রাবণ, পুষ্প রথে চড়েছে।
পুষ্প রথে চড়ে সীতা, ভাবেন গো মনে মনে।
ছিলাম আমি রাজনন্দিনী এলম গো অশোক বনে,
অশোক বনের পাতর কুড়া, কে শুনাল রামের নাম?
নাম শুনে ভাই প্রাণ জুড়াল, কে বট ভাই ভগবান।
ভগবান তো লই গো আমি-আমি বটি হনুমান।
যার লেগে করেছ রোদন তারি আমি অন্বাসন।[৭১]
অযোধ্যা নগরে একটা উঠে গেছে কলরব।
রাম রাজা হবেন বলে, বাদ্য বাজে যত সব।

৬৯ দিব্যি। ৭০ অরণ্য। ৭১ অন্বেষণ, অন্বেষণকারী

রাম বসেছেন সিংহাসনে, বনে বসেন জানকী,
লক্ষ্মণে ধরেছে ছাতা আর আমাদের বাকি কি ?।

১৫৫

চারকণা পখুরটি মা লবঙলতায় ঘিরেছে।
চারধারে চার সরস্বতী মান ভাঙাতে বসেছে।
আন্ গো মিঠাই দে গো থালে,
মান ভাঙাই সবাই মিলে।
মানের কপাট খুল তুষু আইচে তোমার প্রাণনাথ।

১৫৬

আমাদের উঠানের মাঝে চন্দ্র স্থর্য হয় উদয়
চাঁদের গায়ে তুষুর গায়ে দেখব কেমন হয় মিলন।
চাঁদ করে ঝিকিমিকি, রতন কেন উঠে না।
উঠ রতন চেতন কর আমায় জ্বালা দিও না,
দিও না, দিও না জ্বালা, উঠ গো রতনবালা,
কোলে করে নিয়ে যাব যেথায় পাব চাঁদ মালা।
আটচালা চণ্ডীমেলা টাঙাব বনমালা।

১৫৭

সোনামুখীর পথ কোনটি সোনামুখীর পথ গো,
আমার তুষুর নাকে দোলে এক শ' টাকার নথ গো।
একশ টাকার নথ গড়ালাম, ধারে ধারে গোলাপ ফুল,
কন বনে হারালে তুষু হারালে জাঁত্রির ও কুল।
জাঁতি হাতে জাঁতি হাতে, আর বিয়ার কদিন আছে ?
আর বছরকার এমনি দিনে কার কপালে কি আছে !

১৫৮

নদীধারে গাই বিয়াল, গাইটির নাম হাঁসি গো,
বাগাল ভাইকে দুব পিতল বাঁধা বাঁশি গো।

পিতল লয় মা, পিতল লয় মা, সরল গাছের ডগি গো।
বাগাল যখন বাজায় বাঁশি আমরা তখন হেঁসালে,
বেরাই বেরাই মনটা করে, হ্যাঙলা ভাসুর দুয়ারে।
ও ভাসুর তোর পায়ে পড়ি বড় দাদাকে বলিস না।

১৫৯

আম ধরে থোপা থোপা, তেঁতুল ধরে বাঁকা গো।
ই কখনো শুনি নাই মা নাড়ের হাতে শাঁখা গো।
শাঁখারিরা শাখা কাটে, কাটে কদম তলে গো,
গাঁকে এল সরু শাঁকা বেছে পরতেও পেলাম না।
হাত বড়ালম, কুকাজ করলম, রাত্রেতে ঘুম ধরলো না।
ওরে কাল ভ্রমরা
দিন করিস তুই আনাগোনা তুষুর বিয়া হব না।

১৬০

তুষুর মাকে বলে ছিলম, তুষুর বিয়া দাও গো,
আইবড়তে [৭২] ছেলা হল, লাতি কোলে লাও গো।
লাত্তি কোলে লিলে বটে কি কি গয়না দিলে গো।
লাতি বলে 'হাঁতি লুব', হাঁতি কোথায় পাব গো।
ওই আসছে রাজার ব্যাটা লাল ঘোড়া ছুটিয়ে গো।
আসুক আসুক রাজার ব্যাটা ফিরুক গাঁয়ে গাঁয়ে গো।
যার সকলে বিটি আছে ভাদরে পাঠিও না,
ভাদরে ভাদু বিয়া, আশ্বিনে অম্বিকা গো।
কার্ত্তিকে কালিপূজা, ভাই ফোঁটা দিয়া গো।

১৬১

আমার তুষুর ঘোড়ায় বিয়া পঞ্চবটী শ্বশুর ঘর।
কাশীপুরে বাজচে বাঁশি, পুরুলিয়াতে বাসর ঘর।

৭২ অতিবাহিত।

গড় করি মা পুরুলিয়াকে, আর পুরুলিয়া যাব না,
পুরুলিয়ার ওই ফস্‌কা [৭৩] মুড়ি, তুষুর পেটে সইল না।

১৬২

চল তুষু চল খেলতে যাব রানীগঞ্জের বড়তলা,
অমনি পথে দেখে আসব কয়লা খাদে জলতুলা।
জলতুলা ভাই যেমন তেমন জ্বর এল মাথাব্যথা।

১৬৩

তসতোসলা কান তোসলা তসোলা গো রাই
তোমার দৌলতে আমরা ছবড়ি পিঠা খাই।
ছবড়ি লবড়ি গান সিনানে যাই,
গাঙ্গের জলে রাঁদি বাড়ি মকরের জল খাই।
চার মাস বর্ষা পোকন্যা [৭৪] যাই,
পোকন্যাতে দেখে এলাম দুয়ারে মরাই।
ছোট মরাইয়ে হাত দিয়ে বড় মরাইয়ে পা দিয়ে
রাই উঠছেন ঝলমলিয়ে—
কি জানি মা ভবানী তুমাক্ দিব ফুলপানি॥

১৬৪

খেল খেল তুসুলা কোমর বাঁকিয়ে
চাল ভাজা খেতে দোব টোপর ভরিয়ে।
চাল ভাজা খেয়ে তোসলা গলা করে সাঁই,
কতক্ষণ বাদে রে ভাই ভোমরার ঠাঁই।
আজ থাক মা নন্দরানী আনন্দ হয়ে
কাল তুমাকে পূজব আমি এক সাজি ফুল দিয়ে॥

১৬৫

ডালো ভাঙলম ফুলো তুললম তায় বেনালম খঞ্জরী

৭৩ ফোলা, বড় সাইজ। ৭৪ পোখরন্যা<পুষ্কর্ণী।

এ খঞ্জরী কে বাজাবে, তুস্থর বেটা বেহারী [৭৫]
একটি বোঁউকে[৭৬] দুটি কলি, ফুল ফুটে বলিহারী,
দেখো মালি ডাল ভেঙো না, ডাল বিনে শুকায় কলি।

১৬৬

চল তুসু চল খেলতে যাব কুলির পাথর লড়াব,
চলুক পাথর ধীরে ধীরে দামোদরে ভাসাবো।

১৬৭

তুমি যাও মা জলে জলে, আমি যাই হিমালে,[৭৭]
একই সঙ্গে দেখা হবে সেই কদমের তলাতে।
জলে হেলা, জলে খেলা, জলে তুমার কে আছে,
অন্তরে বুঝিয়ে দেখো জলে শ্বশুর ঘর আছে।
আমার তুসু যাচ্ছে জলে, ইষ্টিমারে মাঝজলে।
তোর তুসুকে বলে দেলো সরে দাঁড়াক এক পাশে,
আমার তুসুর ঢেউ লাগিলে উল্টে পড়বেক একপাশে।

১৬৮

কুল গাছে কুহুরের [৭৮] বাসা, ডালিম গাছে কিরকিটা,
আমার তুসু ফাঁদ এড়েছে, পড়েছে রাজার ব্যাটা।
রাজার ব্যাটা পাথর কাটা দাঁতে কুলুপ [৭৯] এড়েছে
ভাগ্যে ছিল আমার তুসু দাঁতে কুলুপ ছাড়িয়েছে।*

১৬৯

কলকাতা যে গেছলেন তুষু কি কি গয়না উঠেছে,
ইলির মিলির ঝিলির কাটা পায়ে পাতমিল আছে।

৭৫ বাহাদুর লোক। ৭৬ বোঁকায়, বোঁটায়। ৭৭ হিম-ঠাণ্ডার মধ্যে
৭৮ কোকিল নয়, এক ধরণের পাখি। ৭৯ তালা, খিল।
* ১৪৬ সংখ্যক গানটির অনুরূপ।

১৭০

আমার তুসু গৌর বর্ণ ইস্কুলেতে পড়াবো
এক খিলি পান পাঁচসিকাতে তবু কিনে খাওয়াব।

১৭১

লাইন ধারে বাবলা গাছটি কেটে করব গোলগাড়ি,
গোল গাড়িতে চেপে যাব ডাকতার বাবুর কেছারী।
ডাকতার বাবু, ডাকতার বাবু. আর খাব না জলসাবু
সর্দিতে ধরেছে মাথা, এনে দাও কমলানেবু।

১৭২

আকবাড়িতে ঢাক বেজেছে আসছে আমার তুসু ধন,
দেখ দেখিনি ব্যজের বালা কতদূরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনের তুসু তুমি বৃন্দাবনে কি কর ?
কেবা তুমার মাথার ফিতা, কার বা তুমি আশ্ কর।

১৭৩

পাহাড়েতে উঠলে তুসু পাহাড়েতে কি আছে
কানে কলম হাতে দোয়াত লারলে[৮০] দখল ফিরাতে।

১৭৪

দক্ষিণ যাব, রথে চাপব. চাপব রথের ধ্বজাতে,
ধ্বজার থেকে চেয়ে দেখব কাশীপুরের রাজাকে।
কাশীপুরের বাসি চাদর রাখবে মা যতন করে,
আমরা দু'বুন মরে গেলে কাঁদবে মা বিনয় করে।

১৭৫

আয়রে ময়রা ধররে ঝাঝরা, দেরে চিনির পাগ[৮১] করে
তুসু যাবেন শ্বশুরবাড়ি দেরে হাঁড়া যাত্[৮২] করে।

৮০ পারলো না। ৮১ পাক। ৮২ রেখে দেওয়া, ভরে দেওয়া।

১৭৬

মাগো মাগো দক্ষিণ যাবো, খিদা লাগলে খাব কি
খুলো তুসু চাদর খুলো রসের মিষ্টি বেঁধে দি।

১৭৭

তুসু তুসু করি আমরা তুসু নাই মা ঘরে গো,
কে তুসুকে লিয়ে গেল ফুলের মালা দিয়ে গো।

১৭৮

চল তুসু খেলতে যাব কুলিতে বাঁধ বাধাব।
কুলির জলে সিনান করে ঝরকায় চুল শুকাব।

১৭৯

নদী ধারে পস্ত রুইলাম পস্ত ঝুরঝুর করে গো
পস্ত বিকে পরব শাঁকা ভাগিন বৌয়ের মুখ বাঁকা।
নদী ধারে বেগুন রুলম্ ৮৩ বেগুন খেলো বাঁদরে,
কি বলে গাল দুব বাঁদর ঘুন ধরুক তোর পাঁজরে॥

১৮০

নদী ধারে তিল বুনিলম ছোট বড় হয় গুটি
ভালো করে বুনবে তাঁতী লাত জামাইয়ের কোড় ধুতি।

১৮১

ছোট নদীর গুড়গুড়ানি বড় নদীর ফেনানি
ফেনান ধরে চলে যাব জনক রাজার কেছারি
সে কেছারি পওসাচুরি বাঁকুড়ায় ধরাধরি।

১৮২

পেছু ধারে দুধের পকুর গামছা ফেলে সাঁতুরব,
সাত ভায়েদের বৌদের সঙ্গে মালতী ফুল পাতাব।

৮৩ রোপন করলাম

উপর কোঠায় উঠলে তুসু সরু করে ছর দিবে
নামবার সময় মনে করে শিবের মাথায় ফুল দিবে ॥

১৮৩

বাজারেবার যাব যাব খুঁটে লিব আছুলী,
যার দোকানে ছাবা শাড়ী দর কর গো তার বাড়ী।

১৮৪

কে কাঁদেরে দালান ধরে
আমার তুসুর মা কাঁদেরে
লীলমণি কোলে করে।

১৮৫

এক কণা চাল আমড়াভাতে, আমড়াস্কুলের হাট যাব,
বাঁক লিলম, বাঁক বাজু লিলম, কই লিলম কানের সোনা,
রয়ে রয়ে পড়ছে মনে শ্বশুর ঘরের গঞ্জনা।

১৮৬

ভারু ড়ু ড়ু খেলতে যেয়ে পায়ে গুপা[৮৪] লেগেছে।
বাঁকুড়াতে দেখলম এসে বিরাল মশাল জ্বেলেছে।
সে বিরালে কি কাজ করে ইংরেজী পুঁতি পড়ে ॥

১৮৭

যখন তুসু বোলতলাতে গেলাসে জল ঢেলেছি
খাও গো খাও গো বিধুমুখী রসের মিঠাই এনেছি।
বড়তলা দিক যাচ্ছ তুসু বড় গাছে কি দুধ আছে ?
পরের মাকে মা বলিলে তাই কি তুমার খেদ মিটে !

১৮৮

রামের বিয়া জনকপুরে জনকরাজার কন্যাকে
দানে দিলে ঘটিবাটি তাথে দিল অঙ্গুরী।

৮৪ পায়ের গোড়ালিতে ব্যথা।

১৮৯

কদম গাছে উঠলে তুষু কচি কদম পেড় না।
পাকলে কদম সবাই খাবে কেউ তো মানা করবে না।

১৯০

এক ছেদামের[৮৫] কলাই ভাজা কন বাজারে ছড়াব ?
ইস্কুলডাঙ্গার তুষুকে ধরে ফুড়াই খাওয়া করাবো।

১৯১

বড়তলাতে কাপড় এল আমার তিষু দর করে,
উয়ার তিষুর নাই গো পয়সা কেঁদে পাড়া গোল করে।

১৯২

ছোট বনে লতাপাতা বড় বনে শালপাতা
আমার তিষু ফেলে আইচে সোনায় বাঁধা লাল ছাতা।

১৯৩

সারা রাজ্যে কোকিল ডাকে তিষু মাকে ভুলাতে ;
ভুল না ভুল না তিষু ভাঙা পালকী এসেছে।

১৯৪

সারা রাজ্য ঘুরে ঘুরে পালব তুটি মনচোরা,
ধরব ধরব মনে করি গগণ চাঁদ কি দেয় ধরা ?
মটা কাপড় আঁটায়[৮৬] বাঁধে পেরাই যায় কোন্ সজনী.
ধরবো জঁটে ফেলব পথে ছাড়াব তোর মস্তানি !

১৯৫

উয়ার তিষুকে বলে ছিলম আমার জমিতে ধান রুইতে
এক কণা টেক মুড়ি দিব হাবলা বেঁতে চিবাতে।

১৯৬

এক ছেদামের টিক্‌লি মালা রাখবি মা যতন করে
যখন আমি চলে যাব কাঁদবি মা বিনয় করে।

৮৫ পুরাতন সিকি পয়সা। ৮৬ কোমরের অংশবিশেষ।

১৯৭

পাহাড়ে যে উঠলে তুষু জমি দখল করিতে,
দু'হাতে দু' কাগচ কলম লারলে দখল ফিরাতে।*

১৯৮

এই তিষুটি কে গড়েছে ইষ্টিশানের মিস্তিরী
গয়নার ভারে চলতে নারে আনগে যা তুই ডাক গাড়ী।

১৯৯

ও পাড়াতে দেখে এলাম উয়ার তিষু তুঁষ চালে,
আমার তুষু বেঞ্চিয়ে বসে ইংরেজী পুথি পড়ে।

২০০

দক্ষিণ ঘটি হাতে করে দক্ষিণে দিয়েছি মন
কতদিনে করবে তিষু জগন্নাথের দরশন।
জগন্নাথের পথে গেলে চোরে ডাকে ঘন ঘন,
দেখ্ দেখনি রাজবালা কতদূরে বৃন্দাবন।

২০১

লালায় লালায় জল ছেড়েছি তায় ধরেছে কদমা গো
আমার তুষুর বিয়া দিব জগঝম্পর বাজনা গো।
জলে হেল জলে খেল, জলে তুমার কে আছে ?
আপনার মনে ভেবে দেখ জলে শ্বশুর ঘর আছে।

২০২

বিষ্টুপুরে গেছলে তিষু কি কি সন্দেশ উঠেছে ?
এড়া বেড়া জিলপি খাজা ফুলাম তেলে ছেঁকেছে।

২০৩

দুর্গাপুরে দেখে এলম তিনটি তুষু যায় চলে,
হাতে যদি থাকতক টাকা লিথম তিষু দর করে।

* এই গানটি ১৭৩ সংখ্যক গানটির অনুরূপ।

২০৪

আসছে বাবু ছড়ি হাতে মাঝখানে বাঁকা সিতা
চাদর ঢাকা মদের বোতুল, ডান হাতে বাদাম ভাজা।

২০৫

অকালে পুষিলাম পায়রা দুধ ভাত দিয়ে গো
সকালে পালাল পায়রা আমায় ফাঁকি দিয়ে গো।
যন[৮৭] দেশকে যাবি পায়রা সেই দেশকে যাব গো,
তর লাগাই[৮৮] লিয়ে পায়রা বদ্দমানেও যাব গো,
বদ্ধমানের এলাচ-লগম বাঁকুড়ারি ছাঁচি পান।
ভাল করে পান সাজবি নইলে তিষুর অপমান।

২০৬

বিষ্টুপুরে দেখে এলাম তিনটি সনার বেহুলা,
কোন্ বেহুলা লিবে তিষু খুল গলার চিকমালা।

২০৭

চারকোণা যে পুকুরটি মা লাগম লতায় ঘেরেছে,
ঐ ঘাটে নাম না তিষু রাম লক্ষ্মণ ডুবেছে।

২০৮

শুশুনি শাক বড় শিমুল তলাতে,
বড় দিদির খুঁটে ধরে তুসু কত কেঁদেছে।
কেঁদো না কেঁদো না তুসু আবার আসবে পৌষ মাসে।
পৌষ মাস যে পড়লো তুসু
আর কেন গো কুমোর ঘরে।
চল তুসু নিতে এসেছে
চন্দন কাঠের চৌদলে।

৮৭ যে। ৮৮ তোর জন্যে

সবাই মিলে হাত তালি দাও।

তুসু যাবেন চালানে।

২০৯

আমার তুসুর খিদা পেইচে কি খেতে দিই গো,
হাঁড়ির ভিতর জোড়া মণ্ডা বার করে দাও গো।
উয়ার তুসুর খিদা পেইচে কী খেতে দিই গো,
টিনের ভিতর চঁয়া মুড়ি বার করে দাও গো।
আমার তুসু ঘুম পেইচে কিসে শুতে দুব গো,
পালংকের উপর লেপ তুস্থক আছে ভাল করে পেতে দাও গো।
উয়ার তুসু ঘুম পেইচে কিসে শুতে দুব গো,
গুয়ালের ভিতর ছেঁড়া বস্তা বার করে দাও গো।

২১০

বাড়ীর নাম কাল তুলসী পাতা ঢল ঢল করে গো।
তার তলাতে বসে আমরা অষ্ট চৌখা খেলি গো।।
অষ্ট চৌখা খেলতে খেলতে চলে এল কলগাড়ী।
কলগাড়ীতে চেপে যাবো বিনাপানীর কেছারী।।
বীনাপানী মরে গেলে বাইশকোপটি চালাবো।
বাইশকোপটি চালায় চালায় কত পয়সা কুড়াব।।

২১১

শীতল কিনে আনো গো সন্ধ্যার পরে
তুষু পূজার জনে,
টাবা[৮৯] কলা নারকোল নেবু গো
দুবো তুষুর চরণে,
ছেনার মিষ্টি রসগোল্লা গো
করে আনো দোকানে।

---

৮৯ দেশী নেবু।

২১২

তুষু দিবো না বিদায়
তুষুর জন্যে ঝাঁপ দেবো লো দরিয়ায়।
একুশ দিন রাখিলাম মাকে যে
একুশ শলতা দিয়ে গো।
আর রাখিতে লারলম মাকে
মকর আইচেন লিতে গো।
ও মকর জল ও মকর জল ও গঙ্গা জল
ভাবের বন্ধু যায় চলে।

২১৩

এতগুলো তুষু বললি
আমার মনে লাগলো না।
আমি যদি ফিরে বলি
তোদের মুরাদ রাখবো না।

২১৪

কালো দেখে নামলাম জলে
জল হল মোর এক গলা,
ও প্রাণনাথ ছেঁকে তুলো
রঙ দেখিবার নাই বেলা।

২১৫

তুষু গাইতে এলি তোরা বসতে দিলাম মাজুরী,
এ মাজুরী কে বুনেছে ছোট দাদার শাশুড়ী।

২১৬

মাছ বনালাম চাকা চাকা মাছের কাঁটা ছিল না
ভাসুর আয়ে করে জিগির এ জীবন আর রাখবো না।

২১৭

আলতা কাপড় খেনি চা্লতা রঙে গাবাবো
কুলির ধারে শুকাত দিয়ে ঐ সতীনকে কাঁদাবো।

২১৮

রাজার রাস পরবে

পাড়া গেঁয়ের গাড়ী আসছে লো সারি সারি।
কেউ বা খাচ্ছে চিঁড়ে মুড়ি লো
কেউ বা খাচ্ছে ভাত রেঁধে।

২১৯

বৃন্দ ধর ছাতা
আলো মেঘে জল পড়ে টপা টপা
জল হচ্ছে মেঘ হইতে লো
তবু হয় না সস্তা চাল।

২২০

'রূপকথা'তে এসেছে 'শোলে' দেখতে যাবো দল মেলে।
ও মেজদি ও সেজদি যাবে গো 'শোলে' দেখতে ?
কি বা মিয়া কি বা ছেলা যাচ্ছে 'শোলে' দেখতে।
'শোলে' বইটা কি যে ভালো, কি যে ভালো লেগেছে।

২২১

ধিনা তা তা ধিন তা ধিনা
কোন যুগে এমন হাওয়া যে দেখিনা।
লাজের মাথা খেয়ে ও যে গো
ভাসুরকে বলে দাদা।
পেট কাটা ব্লাউজ পরে
আবার নাভির নিচে শাড়ী পরা,
স্টিলের ঐ যে গয়না পরে গো
গরবে পা পড়ে না।

তেল বিনে চুল রুখু করে গো
বলে কি না স্টাইল করা।
বাতাসেতে হাঁড়ি নড়ে গো তবু দেখা চাই সিনেমা।
একবার দেখে সাধ মিটে না
বারবার ধরে চাই দেখা।

২২২

আমার তুষুর বিয়ে
সকাল করে আসবি লো তোরা সবে
আমার তুষুর বিয়ে।
তোরা খাবি দাবি বাসর জাগবি
রাত কাটাবি পান খেয়ে।
আমার তুষুর বিয়ে।
রুই কাতলা রসগোল্লা গো
পোলাওতে ঘি দিয়ে।
ডালডা ঘিয়ে পাছে ভোগে
রেখেছি আড়াল দিয়ে।
বর এলো জিপে চড়ে লো
বরযাত্রী বাস লয়ে।
আবার কজন আসানসোলের
মাইকে আজান দিয়ে॥

২২৩

আর ডেকো না প্রাণের কোকিল
তুষু আমার অচেতন,
তুসু যায় মা জলে জলে
আমরা যাই মা কুলিতে।

২২৪

তোদের পাড়ায় বুলতে গেলাম
কুড়ি পেলাম মুরগী ডিম,
কুকুর বলে বেঁধে রাখবো
চেঁচি মরুক সারাদিন।

২২৫

ওলো ওলো কাল্তা ছুঁড়ি
আর মাখিস না তেল পড়া,
তোর কপালে টিকলি দেখে
ভুলেছে কালো ছঁড়া।

২২৬

তদের পাড়ায় দেখে এলাম
তালগাছে চিলের বাঁসা,
ভোর পহরে উড়ি দিয়ে
দেখবো ছুঁড়ির তামাশা।

২২৭

সার ডোবাতে মাগুর পোনা
ই পথে চলতে মানা,
ধরবো জঁটে ফেলবো পথে
গড়ালে বই যাবো না।

২২৮

তুষু তুষু করি আমরা
তুষু নাই মা ঘরে গো,
কে তুষুকে লিয়ে গেল
জলের ঝারা দিয়ে গো

২২৯

মন করি তো মনের কথা বলবো না গো এখানে
তোমার কথায় চলে যাবো আছে গো অনেক দূরে।

২৩০

ওরে ওরে কেলতা ছেঁড়া তুয়ারো তো ডিঙাস না
ধরবো জঁটে ফেলবো পথে গড়ালো বই যাবো না।

২৩১

বাবু সেক্রেটারি
ভোটের মেলা করেছে দেখে আরি।
আসছে ভোটার দলে দলে
খাচ্ছে লো চা পান বিড়ি।

২৩২

সঙ্গে আয় লো তোরা
দেখে যাবি পোকা বাঁধের মাছধরা।

২৩৩

মান করো না তুষু তুমি মানের কপাট খুলেছি,
তুমার মতন তুষু পেলে হিদয় ভরে রেখেছি।

২৩৪

ওরে ময়রা দেরে ঝাঁঝরা ছেঁকে লিব কচোরি,
আমার তুষুর দ্বিরাগমন কাল যাবেক শ্বশুর বাড়ী।

২৩৫

ওলো ওলো কালতা সতীন মাথা বাঁধবি খবরদার,
ধরবো জঁটে ফেলবো পথে গড়ালে বই যাবো না।

২৩৬

সরু সরু নিমের পাতা খেতে গেলে হয় তিতা,
ভাবের বঁধু কয় না কথা অন্তরে দারুণ ব্যথা,

ওগো টুসু অন্তরে দারুণ ব্যথা।

পান বনালাম সারি সারি

সুপারিতে লাগলো গুণ।

ভাবের বঁধু ছেড়ে গেল

জ্বলচে লো তুঁষের আগুন।

২৩৭

বিষ্টুপুরের দলমাদালকে কেউ দাগিতে লেরেচে,

সাবাস সাবাস মদনমোহন দলমাদলকে দেগেছে।

যেখন ছিল মদনমোহন তেখন ছিল গুপ্তাবন[৯০]

মদনমোহন চলে যেতে হইচে লো চাকুন্দারবন॥

২৩৮

ই বন কাটি সে বন কাটি, কাটি বনের শালঝাটি,

শত শত রাজার ছেলে খুঁজেছে দাঁতন কাঠি।

ওলো টুসু খুঁজেছে দাঁতন কাঠি।

২৩৯

তাল গাছেতে চিলের বাসা ছুড়ির বাসা ঝোড়বনে,

ঐ ছুড়িকে নিয়ে গেল আগড়দার মুছুরমানে।

২৪০

তদের পাড়ায় টুসু আছে তাই করি আনাগনা,

কাল সকালে চলে যাবে করবি লো দুয়ার মানা।

২৪১

পালা পালা করিস তোরা আমি তো না পালাবো,

ছঁড়ার গলায় ঘণ্টা দিয়ে বিষ্টুপুরে চরাবো।

৯০ গুপ্ত বৃন্দাবন। বিষ্ণুপুরকে মল্লরাজারা গুপ্ত বৃন্দাবন রূপেই গড়ে তুলেছিলেন।

২৪২

টুষু দেখতে এলি তোরা ওগো বসগে যা আমড়া তলে
আমড়া ফুলের মালা গেঁথে দিব লো তাদের গলে।

২৪৩

বাঁকুড়াতে দেখে এলাম তিনটি সোনার বেহালা
কোন বেহালা লিবে টুষু খুলো গলার চিকমালা।

২৪৪

ওলো টুষু এত আমি জানি না
প্রেমে তুমি পড়ে থাকবে
সেখানে তো যাবো না।

২৪৫

জলে জলে আমরা যাই গো জল ধারে।
টুষুর সঙ্গে হবেক দেখা সেই জড়া কদমতলে॥

২৪৬

ইপার গেলম উপার গেলম কালো কয়লা আনিতে।
এত কিসের দেরি হল অঝড়ে বাণ পড়েছে।
ওরে মাঝি ধররে লৌকা, দেরে টুষু পার করে।
টুষুর নাকের সোনার নলুক তুলে দিব তোর হাতে॥

২৪৭

আচিরে পাচিরে ঝিঙা, ঝিঙা বই আর জানে না,
আমার টুষু শিশু ছেলে ভাতার ঘর যে করবে না।

২৪৮

শ্রীরাম চন্দ্র যায় বনে বনে দেখ পিতৃসত্য পালনে,
পিতৃসত্য পালিবারে শ্রীরামচন্দ্র যায় বনে।
সঙ্গেতে যায় লক্ষ্মীদেবী লক্ষ্মণ ঠাকুর তার সনে॥

২৪৯

দেখ দেখ প্রিয় সোনার হরিণ কেমন
আঙ্গিনার মাঝে ঘুরে বেড়ায়
দেখলে গো জুড়ায় নয়ন।

কি সুন্দর সোনার হরিণী ভালে [৭১] কত ঘনে ঘন,
পুষিব আমি সোনার হরিণ ধরে দাও প্রাণের লক্ষ্মণ ॥

২৫০

শুধু শুধু প্রেম তো হবে না
হাতে হাতে দিতে হবে দখিনা
এ যুগে আর শুধু হাতে প্রেম তো হবে না।

২৫১

একা ধনি যাসনা কদমতলাতে
ও কালা আছে কদমতলাতে।

২৫২

ও তুই বলবি যা তোর বাবাকে,
ঘর জামাই রাখবে কি আমাকে ॥

২৫৩

প্রভু মদনমোহন
বিষ্টুপুরে কবে করবে আগমন।
তোমা বিহনে সবে গো
কাঁদে শত শত জন।

তুমি বিনা মন্দিরেতে শোভে না গো প্রাণমন।
তোমার বিনে মন্দিরেতে শোভে না গো প্রাণমন।

৭১ দেখে। ভাল্ ভাল্—দেখ, দেখ (বাঁকুড়ার চলতি শব্দ)।

তোমার নামে বিষ্ণুপুরে গো
হল গুপ্ত বৃন্দাবন,
তোমার দলমাদল হয়ে আছে
তুমি বিনে অচেতন।
যমুনা কালিন্দীর জল গো
আজো করে টলমল,
তোমার রাসমন্দির ফাঁকা আছে
দেখে এখন সর্বজন।
তোমার লীলা কি বর্ণিব হে
আমি অতি ক্ষুদ্রজন,
আমরা সবাই মিলে মাগি
তোমার রাঙা শ্রীচরণ ॥